'হিরোজ অব ইসলাম' সিরিজের অনুবাদ

উম্মাহর কিংবদন্তিরা

অনুবাদ ও সংকলন
মুহাম্মাদ আম্মারুল হক

সন্দীপন

সূচিপত্র

ফিক্বহের দিকপাল

ইমাম আজম আবূ হানিফা رحمه الله

উম্মাহর মাঝে ইলম, যুহদ, কুরবানির কৃতিত্বের বহুমুখী সাক্ষর রেখে গেছেন ইমাম আজম আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ)। তিনি হিজরি সনের আশিতম বর্ষে (খ্রিস্টীয় ৬৯৯ সনে) জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান ইরাকের কুফা। হানাফি ফিক্বহ আজ গোটা মুসলিম বিশ্বের অর্ধাংশ জুড়ে অনুসৃত হয়।

ইমাম আবূ হানিফার মূল নাম নুমান ইবনু সাবিত। আবূ হানিফা তাঁর কুনিয়াত বা উপাধি। 'আবূ হানিফা' শুনে অনেকেই মনে করেন যে, তাঁর কোনো কন্যা সন্তানের নাম হানিফা ছিল। সেখান থেকেই বুঝি আবূ হানিফা এসেছে। আবূ হানিফা অর্থ হানিফার বাবা। কিন্তু আবূ হানিফার এই নামে কোনো সন্তান ছিল না। এটা স্রেফ তাঁর উপাধি। 'হানিফ' শব্দের অর্থ হলো একনিষ্ঠ, খাঁটি। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

তারপর আমি আপনার প্রতি ওহী নাযিল করলাম যে, আপনি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাত (আদর্শ) অনুসরণ করুন; এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[১]

---

[১] সূরা নাহল (১২৩)

অনারব ইমাম

ইমাম আবূ হানিফার (রহিমাহুল্লাহ) একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, তিনি আরব ছিলেন না। তৎকালীন বহু ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছিলেন অনারব। কেউ কেউ ছিলেন বাহির থেকে আসা দাস পরিবারের সদস্য। তবে ইমাম আবূ হানিফার ব্যাপারটা আলাদা।

তাঁর পিতা সাবিত ছিলেন খুবই ধনী ব্যক্তি। সাবিতের পিতা ইবরাহিমের সাথে হযরত আলির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। কথিত আছে যে, ইবরাহিম তার পুত্রকে আলির কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন,

‘আমার এবং আমার ছেলের জন্য দুআ করে দিন।’

তা-ই করেন হযরত আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। ইবরাহীমের পরিবারের জন্য বারাকাহ’র দুআ করেন। এও কথিত আছে যে, ইবরাহীমের বংশে ইমাম আবূ হানিফার জন্ম আসলে হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দুআর ফসল।

সাহাবি-সান্নিধ্য

প্রজন্মের দিক দিয়ে ইমাম আবূ হানিফা একজন তাবিয়ি। তাবিয়ি বলা হয় তাঁদেরকে, যারা অন্তত একজন সাহাবির সরাসরি সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। ইমাম আবূ হানিফার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল আনাস ইবনু মালিকের (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি হিজরি ৯৩ সনে ইন্তিকাল করেন।

বালক বয়সেই আনাসের সাক্ষাৎ পান আবূ হানিফা। হযরত আনাস ইবনু মালিক ছিলেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম। তাঁকে ‘খাদিমু রাসুলিল্লাহ’ বলা হয়। যখন আল্লাহর রাসুল মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন আনাস দশ বছরের ছোট্ট বালক। তাঁর মা তাঁকে রাসুলুল্লাহর কাছে খাদেম হিসেবে দিয়ে এসেছিলেন।

সেইসাথে আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যেও অন্যতম। কারণ, তিনি দীর্ঘ হায়াত লাভ করেছেন। একশ বছরেরও বেশি। তিনি নিজের সম্পর্কে বলতেন,

'এই মুহূর্তে জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র আমিই আছি, যে দুই কিবলা সামনে নিয়ে সালাত পড়তে পেরেছে।'

দুই কিবলা মানে মাসজিদুল আকসা ও মাসজিদুল হারাম। সাহাবিদের মধ্যে যারা দুনিয়া থেকে একদম শেষে বিদায় নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তিনিও একজন। এছাড়াও আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর দুআর বারাকাহ লাভের কারণে একশজনের অধিক সন্তানসন্ততি ছিল তাঁর। যেহেতু তিনি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছেন, তাই বহু তাবিয়ি তাঁর কাছ থেকে ইলম শিখেছেন, হাদীস নিয়েছেন। দুই হাজারের অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি। মানুষকে প্রায়ই বলতেন,

يا بَنِيَّ ! قَيِّدوا العِلمَ بالكِتابِ

'বাবারা, কিতাবের মধ্যে ইলমকে লিখে রেখো।'

এভাবেই তিনি গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ইলম সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। ইমাম আবূ হানিফার ক্ষেত্রেও তা-ই করেছেন তিনি।

আসলে আমাদের সালাফগণ এমনই সচেতন ছিলেন। শুনে শুনে শেখার সময় সবই লিখতে হবে তা নয়, কিন্তু মূলকথাগুলো লিখে নেয়াই উচিত। এটি ভালো করে জানতেন তাঁরা। লিখে নেয়ার উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানকে সংরক্ষণ করা। পরবর্তী সময়ে মুখস্থ করাও সহাজ্জ হয় তাতে।

লোকে যারে ভালো বলে

ইদানীং কেউ কেউ ইমাম আবূ হানিফার (রহিমাহুল্লাহ) প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তাঁকে নিয়ে ভুল ধারণাও আছে অনেকের। এটি ঠিক যে, বহু সালাফ ইমাম আবূ হানিফার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য রাখতেন। কিন্তু ইমামের ফিকহি পাণ্ডিত্য সম্পর্কে উঁচু ধারণা ছিল সবারই।

সুফিয়ান আস সাওরী (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন ইমাম আবূ হানিফার সমসাময়িক। তিনিও কুফায় বসবাস করতেন। তো একবার তাঁর এক শাগরেদকে কোথাও থেকে আসতে দেখে প্রশ্ন করলেন,

'কোথা থেকে আসছ?'

সে বলল, 'ইমাম আবূ হানিফার মজলিস থেকে।'

তখন সুফিয়ান বললেন,

لقد جئت من عند أفقه أهل الأرض

'নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছ তুমি।'[২]

কিছু বোকা লোক বলে যে, ইমাম আবূ হানিফা হাদীস জানতেন না। এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। তিনি ইলমে দ্বীনের সার্বিক শাখায় পণ্ডিত ছিলেন। আর হাদীস জানা ব্যতীত ফিক্বহের বুৎপত্তি অর্জন করা অসম্ভব।

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহিমাহুল্লাহ) হলেন ইমাম আবূ হানিফার ছাত্র। তিনি তাঁর ওস্তাদ ইমাম আবূ হানিফাকে আল্লাহর একটি নিদর্শন বলতেন। তিনি বলেন,

رأيت أعبد الناس، ورأيت أورع الناس، ورأيت أعلم الناس، ورأيت أفقه الناس

'আমার দেখা মানুষদের মাঝে তিনি সবচেয়ে ইবাদতগুজার, সবচেয়ে পরহেযগার, সবচেয়ে বেশি ইলমের অধিকারী এবং ফিক্বহের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত।'[৩]

তিনি আরও বলেন,

اما أعبد الناس فعبد العزيز بن أبي رواد وأما أورع الناس فالفضيل بن عياض وأما أعلم الناس فسفيان الثوري وأما أفقه الناس فأبو حنيفة ثم قال ما رأيت في الفقه مثله

'আমার দেখা সবচেয়ে বেশি ইবাদতগুজার আবদুল আজিজ ইবনু আবী দাউদ,

---

[২] তারীখে বাগদাদ (১৩/৩৪৪), তাবয়ীযুস সহিফাহ ফি মানাকিবি আবী হানিফা (১০৪), তাযহিবু তাহযিবিল কামাল ফি আসমাঈর রিজাল

[৩] কিতাবু মাআনিল আখয়ার ফি শারহি আসামি রিজালি মাআনিল আসার-বদরুদ্দীন আইনী

সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু ফুযাইল ইবনু আয়ায, সবচেয়ে বেশি ইলমের অধিকারী সুফিয়ান আস সাওরী, ফিকহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পণ্ডিত ইমাম আবূ হানিফা।'[৪]

তিনি আরও বলেন,

وما رأيت أحدا قط تكلم في الفقه أحسن من أبي حنيفة

'ফিক্বহ নিয়ে ইমাম আবূ হানিফার চেয়ে সুন্দর করে আর কাউকে বলতে দেখিনি।'[৫]

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক নিজেও ইলমে হাদীসের কিংবদন্তি। তিনিও ইমাম আবূ হানিফার ফিক্বহী পাণ্ডিত্য স্বীকার করে নিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম আবূ হানিফা সম্পর্কে বলেছেন,

يجب على أهل الإسلام أن يدعو الله لأبي حنيفة في صلاتهم وذكر حفظه عليهم السنن والفقه

'সালাতে আল্লাহর নিকট আবূ হানিফার জন্য দুআ করা মুসলিমদের কর্তব্য।' এরপর সুন্নাহ ও ফিক্বহ সংরক্ষণের মাধ্যমে আবূ হানিফা মুসলিম উম্মাহর কতটা উপকার করেছেন, এ প্রসঙ্গে আলোচনা তুলে ধরেন তিনি।[৬]

ইমাম যাহাবি (রহিমাহুল্লাহ) সিয়ারু আলামিন নুবালা গ্রন্থে ইমাম আবূ হানিফাকে আদমের (আলাইহিস সালাম) শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন বলেছেন।

ফুযাইল ইবনু আয়ায (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে বলেন,

ان أبو حنيفة رجلاً فقيهاً معروفاً بالفقه، واسع المال، معروفاً بالأفاضل على كل من يطيف به، صبوراً على تعلم العلم بالليل والنهار، حسن الليل، كثير

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা, তারীখে বাগদাদ

[৫] তাহযিবুল আসমাঈ ওয়াল লুগাত, কিতাবুল আসার, তারীখে বাগদাদ

[৬] (খতীব বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ, ১৫/৪৫৯)

الصمت، قليل الكلام حتى ترد مسألة في حلال أو حرام، فكان يحسن أن يدل على الحق، هارباً من مال السلطا

'আবূ হানিফা একজন সুপ্রসিদ্ধ ফকিহ। পাশাপাশি অগাধ সম্পদশালী। নিজের আশপাশের মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজ করার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। দিবারাত্রি ধৈর্য ধরে ইলম শিখতেন। রাত্রিযাপন করতেন উত্তমভাবে (তাহাজ্জুদ আদায়ের মাধ্যমে)। দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকতেন তিনি। হালাল ও হারাম বিষয়ে তাঁর সামনে কোনো মাসআলা উপস্থাপন করার আগপর্যন্ত কথা কমই বলতেন। সব সময় সত্যের পথে উত্তমরূপে থাকতেন। আর পালিয়ে বেড়াতেন শাসকের সম্পদ থেকে।'[৭]

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ শৈশব

ইমাম আবূ হানিফার যখন জন্ম হয়, তখন মুসলিমরা চরম নির্যাতিত। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা তখন সত্যিই অত্যাচারীদের হাতে। ন্যায়বিচারবিহীন এক অস্থির সময় চলমান। এ অস্থিরতার শুরু হযরত আলির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খিলাফতের তথা হিজরি ৩৪/৩৫ সনের পর থেকেই।

তখন ইরাকের কুফার গভর্নর ছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। হাজ্জাজ প্রায় বিশ বছর কুফা শাসন করে। তার অত্যাচারের মাত্রা এত বেশি ছিল যে, তার হাতে সাহাবি পর্যন্ত শহীদ হয়েছেন। কতটা জালিম হলে সাহাবিকে শহীদ করা যায়! হাজ্জাজ তা-ই করেছিল। তার হাতে শহীদ হয়েছেন সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), প্রখ্যাত তাবিয়ি সাঈদ ইবনুয যুবাইর (রহিমাহুল্লাহ)। আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যার জন্যও দায়ী হাজ্জাজ। হাজ্জাজকে আবদুল্লাহ ইবনু উমর ফাসিক বলেছিলেন। হাজ্জাজ মক্কায় একটি সেনাবাহিনী পাঠায়। এক সৈনিকের বর্শার আঘাত লাগে আবদুল্লাহ ইবনু উমরের পায়ে। সেই ঘায়ের কারণেই ইবনু উমর ইন্তিকাল করেন কয়েকমাস পর।

এহেন গোলযোগ ও জুলুমের শাসনের সময় ইমাম আবূ হানিফার (রহিমাহুল্লাহ)

[৭] উসূলুদ্দিন ইন্দা আবী হানিফা

জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তিনি ছোট থাকতেই ইন্তিকাল করেন তাঁর পিতা। কোনো ইলমী পরিবেশে বেড়ে উঠার সুযোগ পাননি তিনি। অন্যান্য ইমাম ও আলিমগণ ইলম শেখার পরিবেশ তাঁদের ঘরেই পিতামাতার কাছে পেয়েছেন। যেমন ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ তাঁদের পিতামাতার কাছ থেকে সঠিক দিকনির্দেশনা পেয়েছেন। তাঁদেরকে বলা হয়েছে, এটা শেখো, ওটা শেখো। কিন্তু ইমাম আবূ হানিফা পাননি এই পরিবেশ। তবে কুফায় বসবাসরত আলিমগণের সংখ্যাও কম ছিল না। তৎকালীন ইলমের প্রধান কেন্দ্র বলা যেতে পারে কুফাকে।

পিতার ইন্তিকালের পর আবূ হানিফা ব্যবসা শুরু করেন। মূলত কাপড়ের ব্যবসা করতেন তিনি। এটিই ছিল তাঁর পৈত্রিক ব্যবসা।

ইলমের পথে যাত্রা শুরু

আবূ হানিফা তখন বিশ বছরের তরুণ। ইমাম আশ শা'বি রহিমাহুল্লাহ নামে একজন ইলমে দ্বীনের পণ্ডিত ব্যক্তি কুফায় বসবাস করতেন। আশ শা'বি সম্পর্কে ইবনু সিরীন বলেন,

'কুফায় এসে যখন ইমাম আশ শা'বিকে দারস দিতে দেখি, তখনও অনেক সাহাবি জীবিত ছিলেন।'

কত বড় আলিম হলে সাহাবিদের জীবদ্দশাতেও কুফাতে দারস দেওয়া যায়!

ইমাম আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

مررت يوماً على الشعبي وهو جالس، فدعاني وقال: إلى من تختلف؟ فقلت: اختلف إلى فلان. قال: لم أعن إلى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء. فقلت له: أنا قليل الاختلاف إليهم. فقال الشعبي لـ أبي حنيفة: لا تفعل، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء؛ فإني أرى فيك يقظة وحركة. قال: فوقع في قلبي من قوله، فتركت الاختلاف - يعني: إلى السوق - وأخذت في العلم، فنفعني الله تعالى بقوله

'একবার ইমাম আশ শা'বির মজলিস অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম। ইমাম আমাকে থামিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কার কাছে যাও?" বললাম, "অমুকের কাছে বাজারে

যাচ্ছি।" আশ শা'বি বললেন, "সেটা বলিনি। বলছি কোন কোন আলিমের কাছে আসা-যাওয়া করো।" আমি বললাম, "আসলে আলিমগণের মজলিসে আমার কমই যাওয়া হয়।"'

তখন ইমাম আশ শা'বি তরুণ আবূ হানিফাকে বললেন, 'এমনটা কোরো না। তোমার অবশ্যই উচিত ইলম অর্জনের দিকে নজর দেওয়া এবং আলিমগণের মজলিসে আসা-যাওয়া করা। কারণ, আমি তোমার মাঝে উদ্যম ও জাগরণ দেখতে পাচ্ছি।'

এরপর ইমাম আবূ হানিফা বলেন, 'ইমাম আশ শা'বির এ কথাটি আমার অন্তরে বসে যায়। তাই আমি বাজারে আসা-যাওয়া ছেড়ে দিয়ে ইলম অর্জন করতে শুরু করি। আল্লাহ তাআলা তাঁর (ইমাম আশ শা'বি রহিমাহুল্লাহ) ওই কথার মাধ্যমে খুবই উপকৃত করেছেন আমাকে।'[৮]

আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাদের এমন এক অন্তর্দৃষ্টি দান করেন, যা দিয়ে তাঁরা মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ফেলতে পারেন; যেমনটা পেরেছিলেন ইমাম আশ শা'বি (রহিমাহুল্লাহ)। তিনি তরুণ ইমাম আবূ হানিফার মধ্যে সেই আলো দেখতে পেয়েছিলেন, যা ইমাম পরবর্তীকালে ছড়িয়ে দিয়েছেন পুরো বিশ্ববাসীর মাঝে।

যুক্তিতর্কের গলিপথে

ইমাম আশ শা'বির (রহিমাহুল্লাহ) সাথে সাক্ষাতের পর বিশ বছরের তরুণ আবূ হানিফা ইলম শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। শিখতে শুরু করেন ফিকহ। কিন্তু এরপর তিনি ইলমুল কালাম শেখা শুরু করেন কিছু কারণে। যাওয়া-আসা করেন 'আহলুল কালাম' তথা কালাম শাস্ত্রবিদগণের কাছে।

ঠিক কী কারণে তিনি তা শেখা শুরু করেছিলেন, সেটি নিশ্চিত করে জানা যায় না। 'আহলুল কালাম' বলা হয় তাদেরকে, যারা যুক্তিতর্কে পারদর্শী। আহলুল কালামগণ ধর্ম, আকিদা, ঈমানকে নাস্তিকদের সামনে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে প্রমাণ করতেন। কারণ, সেসময় নাস্তিক্যবাদী ধারণার দৌরাত্ম্য বেড়ে গিয়েছিল খুব। ছড়িয়ে পড়ছিল

[৮] কিতাবু সিলসিলাতি উলুয়িল হিম্মাহ- মুহাম্মদ বিন আহমাদ ইসমাঈল (১১)

উদ্ভট ও বিকৃত সব মতবাদ। তাই মুসলিমদের নিজেদের দ্বীন ও আক্বিদা টিকিয়ে রাখতে যুক্তিতর্কশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

ইমাম আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ)-ও যুক্তিতর্কে দক্ষ হয়ে ওঠেছিলেন। যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো হাস্যকর কথা বলে আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলত অথবা দ্বীনকে উপহাস করত, সাথে সাথে ইমাম আবূ হানিফা তার কাছে গিয়ে তর্ক করে তাকে হারিয়ে দিয়ে আসতেন। এতটাই পেশাদার বিতার্কিক ও মেধাবী ছিলেন তিনি। বেশিরভাগ আহলুল কালাম বসরায় বসবাস করত। নাস্তিক্যবাদী ধারণাও সেখানে ছড়াত বেশি। তাই তিনি প্রায়ই বসরা যেতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি বিশবারেরও বেশি বসরায় গিয়েছি তর্ক করতে।'

ইমাম আবূ হানিফা যার সাথেই তর্ক করতেন, সেখানেই বিজয়লাভ করতেন। কিন্তু কিছুকাল পর ইলমুল কালাম চর্চা ছেড়ে পুরোপুরি ফিক্বহে আত্মনিয়োগ করেন তিনি। ছেড়ে দেওয়ার প্রধান কারণ দুটি :

প্রথমত, তিনি ভেবে দেখলেন যে, সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) দ্বীন ও শরিয়তের বিষয়ে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী ছিলেন। অনেক বেশি পাণ্ডিত্য ছিল তাঁদের। কিন্তু তাঁরা তবুও দ্বীন নিয়ে তর্ক করতেন না। ইলম চর্চা করতেন, ফতোয়া দিতেন ঠিকই। কিন্তু তর্কবিতর্কে জড়াতেন না কখনোই। বরং তর্কবিতর্ক থেকে নিষেধ করতেন যথাসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, তখনকার সময়ে যারা ইলমুল কালাম চর্চা করত, তাদের অন্তর শক্ত হয়ে যেত। তাদের ভাষা ছিল রূঢ়। সহাজ্জতা, কোমলতা ছিল না তাদের মধ্যে। উপরন্তু তারা যতটা না দ্বীনের বিজয়ের নিয়তে তর্ক করতেন, তারচেয়ে বেশি করতেন ব্যক্তিগত অহমের বশে।

তৃতীয় আরও একটি কারণ ছিল। একদিন তাঁর কাছে তালাক সংক্রান্ত একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসে এক মহিলা। ইমাম আবূ হানিফা উত্তর দিতে পারলেন না। মহিলাকে বললেন কুফার আরেক বিশিষ্ট ফকিহ হাম্মাদ ইবনু আবী সুলায়মান ﵀-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে। তিনি যেন জেনে এসে তাঁকেও এ সম্পর্কে

অবগত করেন। কারণ, ইমাম আবূ হানিফা নিজেও জানতেন না এই মাসআলার সমাধান। তা-ই করলেন সেই নারী। তা শুনে আবূ হানিফা বলে উঠলেন,

'ব্যস, আর নয় আহলুল কালামদের সঙ্গ। তর্কবিতর্ক ছেড়ে দিয়ে ফিক্বহ চর্চা শুরু করব আমি।'

ফিক্বহের রাজপথে প্রত্যাবর্তন

শুরু হলো ইমাম আবূ হানিফার (রহিমাহুল্লাহ) পুরোদমে ফিক্বহ শিক্ষা। বিভিন্ন ওস্তাদ ও শাইখের কাছে আসা-যাওয়া শুরু করেন তিনি। ইলম গ্রহণ শুরু করেন সবার কাছ থেকে। কথিত আছে যে, তাঁর শিক্ষকের সংখ্যা চার হাজার বা এর কিছু কম। তবে সংখ্যায় যে তাঁরা অগণিত ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

আবূ হানিফার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক ছিলেন হাম্মাদ ইবনু আবী সুলায়মান (রহিমাহুল্লাহ) কুফার প্রসিদ্ধ এই ফক্বিহ'র মৃত্যু ১৬৭ হিজরিতে। তিনি আবার আরেক প্রখ্যাত ফক্বিহ ও তাবিয়ি ইবরাহীম আন নাখঈর (রহিমাহুল্লাহ) প্রধান শাগরেদ। ইবরাহীম আন নাখঈ বহু সাহাবির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।

হাম্মাদ ইবনু আবী সুলায়মানের বয়স যখন আশি বছর, সেসময় ইলম শিখতে আসেন আবূ হানিফা। প্রত্যেক শিক্ষকই এমন ছাত্র চান, যাকে পড়িয়ে মজা পাওয়া যায়। বানানো যায় নিজের ইলমের উত্তরাধিকারী। ইমাম আবূ হানিফার মাঝে সেই ছায়া দেখতে পান হাম্মাদ।

দীর্ঘ গুরুসান্নিধ্য

ওস্তাদ হাম্মাদের সাথে দশ বছর কাটিয়ে আবূ হানিফা ভাবলেন,

'আমি এখন অনেক ইলম অর্জন করে ফেলেছি। এখন নিজেই নিজের হালাকা শুরু করতে পারি।'[১]

[৯] সেসময় কুফায় শাইখভিত্তিক ইলম চর্চা হতো। প্রত্যেক ফক্বিহ ও ওস্তাদের থাকত নিজস্ব ইলমী মজলিস, তথা 'হালাকা'।

অনুমতি চাইতে যাবেন ওস্তাদের কাছে। এরপর কী হলো, তা ইমাম আবূ হানিফা নিজেই বলেন,

فصحبته عشر سنين ، ثم نازعتني نفسي لطلب الرئاسة فأحببت أن أعتزله وأجلس في حلقة لنفسي . فخرجت يوماً بالعشي وعزمي أن أفعل ، فلما دخلت المسجد ورأيته لم تطب نفسي أن أعتزله ، فجئت وجلست معه ؛ فجاءه في تلك الليلة نعي قرابة له قد مات بالبصرة وترك مالاً وليس له وارث غيره ، فأمرني أن أجلس مكانه

'দশ বছর শিক্ষা অর্জনের পর মনে হলো যে, এবার তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে নিজেই হালাকা খুলে বসি। এই ভেবে একরাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তাঁর কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলাম। কিন্তু মাসজিদে ঢোকার পর আর মন সায় দিচ্ছিল না তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতে। বসে পড়লাম তাঁর সাথে। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে সংবাদ এলো যে, বসরায় বসবাসরত তাঁর এক আত্মীয়ের মৃত্যু হয়েছে। তার রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকারী কেবলমাত্র তিনিই আছেন। তাই বসরা যেতে হবে তাঁকে। যাবার আগে তাঁর স্থানে বসে দারস প্রদানের আদেশ দিয়ে গেলেন আমাকে।'[১০]

আল্লাহ তাআলার কী কুদরত! ইমাম আজম আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সংকল্পের কথা নিজ মুখে বলতে পারেননি। অথচ তাঁর ইচ্ছাপূরণের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা।

হাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) দুই মাসের জন্য বসরায় চলে গেলেন। কুফার মানুষজন ফতোয়া জানার জন্য আসতে থাকল ইমাম আবূ হানিফার কাছে। ওস্তাদের কাছ থেকে শেখা উত্তরগুলো দিতে লাগলেন তিনি। তবে এরমধ্যে কিছু নতুন প্রশ্নও এলো। নতুন প্রশ্নের সংখ্যা ছিল ষাটটি। এসব প্রশ্নের উত্তর আবূ হানিফা নিজ থেকে দিয়ে লিখে রাখলেন।

ওস্তাদ হাম্মাদ ফিরে এলে তাঁকে প্রশ্নোত্তরগুলো দেখে দিতে বলেন তিনি। হাম্মাদ চল্লিশটির সাথে একমত পোষণ করেন এবং বাকি বিশটি উত্তরের ব্যাপারে ভিন্ন মতামত দেন। এ ঘটনার পর ইমাম আবূ হানিফা বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে ওস্তাদের

[১০] তারীখে বাগদাদ লিল খতিব বাগদাদী

সাথে থেকে আরও অনেক ইলম অর্জন করতে হবে। আরও গভীরভাবে ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করেন তিনি।

ওস্তাদের স্থলাভিষিক্ত

১৬৭ হিজরিতে হাম্মাদ ইবনু আবী সুলায়মানের (রহিমাহুল্লাহ) ইন্তিকালের আগপর্যন্ত তাঁর ছাত্র হিসেবেই ছিলেন আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ)। বসরায় থাকাকালে কোনো প্রশ্ন পেলে তিনি কুফায় এসে হাম্মাদের থেকে উত্তর জেনে তারপর জানাতেন। এভাবে হাম্মাদের ছাত্র হিসেবে কাটিয়ে দেন আঠারো বছর। এরপর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। নববী ইলমের এটাই ধারাবাহিকতা, যা দীর্ঘ সংশ্রব, সংগ্রাম ও কষ্ট ছাড়া অর্জিত হয় না। ইমাম আবূ হানিফা সারা জীবন তাঁর ওস্তাদ শাইখ হাম্মাদ ইবনু আবী সুলায়মানের জন্য দুআ করেছেন। তিনি বলেন,

والله ما دعوة لوالدي بالمغفرة إلا دعوت لحماد وما ذكرت والدي إلا ذكرت حماد

'আল্লাহর কসম, আমি যখনই আমার পিতামাতার মাগফিরাতের জন্য দুআ করেছি, তখন সাথে সাথে তাঁর জন্যও দুআ করেছি। যখনই আমার পিতামাতার আলোচনা করেছি, তখন হাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ)-কেও স্মরণ করেছি।'

ইমাম আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন ছাত্রদের প্রতি খুবই উদার। তাঁর ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

'আল্লাহর শপথ, আমি আপনার মতো উদার কাউকে দেখিনি।'

কারণ ইমাম আবূ হানিফা প্রায় বিশ বছর আবূ ইউসুফ ও তাঁর পরিবারের ভরণপোষণ দিয়েছেন।

এই উদারতা ও বড় অন্তরের অধিকারী হওয়ার গুণ তিনি পেয়েছেন নিজের ওস্তাদ শাইখ হাম্মাদের কাছ থেকে। সত্যিকার শিক্ষকের গুণ এমনই। তাঁর কাছে শিক্ষার্থী

শুধু ইলমই পায় না, সাথে লাভ করে আরও বহু গুণাবলি।

শিক্ষার সনদ

ইমাম আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) যেমনভাবে ওস্তাদের প্রতি ভালোবাসা রেখেছেন, আলিমগণের প্রতি সেরকম ভালোবাসা রাখা আমাদেরও কর্তব্য। কারণ তাঁরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেখে যাওয়া ইলমের উত্তরাধিকারী। একদম নবিজি পর্যন্ত পৌঁছায় তাঁদের শিক্ষা-শিক্ষণের ধারা।

তখন আব্বাসী খলীফা আবূ জাফর আল মানসুরের শাসনামল। একবার ইমাম আবূ হানিফা খলীফার দরবারে যান। তাঁকে তাঁর ইলমের ওস্তাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন খলীফা আবূ জাফর আল মানসুর। অনেকেই আবূ হানিফার ইলম নিয়ে বাজে মন্তব্য করত, হিংসা পোষণ করত। তাই খলীফা এই প্রশ্নটি করেন। ইমাম আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

قال أبو حنيفة: دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين، فقال لي: يا أبا حنيفة عن من أخذت العلم؟. فقلت: عن حماد (يعني ابن أبي سليمان) عن إبراهيم (يعني النخعي) عن عمر ابن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس. فقال أبو جعفر: بخٍ بخٍ استوفيت يا أبا حنيفة

'আমি আমিরুল মুমিনীন আবূ জাফরের দরবারে উপস্থিত হলে তিনি প্রশ্ন করলেন, "আবূ হানিফা, আপনি কার কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন?" বললাম, "আমি হাম্মাদ ইবনু আবী সুলায়মান থেকে গ্রহণ করেছি। তিনি গ্রহণ করেছেন ইবরাহীম আন নাখঈ থেকে। তিনি গ্রহণ করেছেন উমর ইবনুল খাত্তাব, আলি ইবনু আবী তালিব, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রহিমাহুমুল্লাহ) থেকে।" তখন আবূ জাফর বললেন, "বাহ বাহ আবূ হানিফা! আপনি তো ইলমের সবটুকু পেয়েছেন তা হলে!"'[১১]

এটাই ছিল আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর ইলমের সনদ।

[১১] কিতাবুল মাদখাল ইলা দিরাসাতিল মাযাহিবিল ফিকহিয়াহ (৭৬)- আলি জুমুআহ

আবু হানিফার অন্যান্য শিক্ষক

ইমাম আশ শা'বি (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম আবূ হানিফার প্রধান শিক্ষক ছিলেন না। কিন্তু তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি আবূ হানিফাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন ইলম অর্জনের। ইমাম আশ শা'বিও ছিলেন উত্তম গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তি। একবার এক লোক আশ শা'বিকে গালমন্দ করলে তিনি ওই ব্যক্তিকে বললেন,

إن كنت صادقًا غفر الله لي، وإن كنت كاذبًا غفر الله لك

'যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন।'[১২]

তিনি পালটা গালমন্দ করেননি, অসদাচরণ করেননি। উলটো তাঁর জন্য দুআ করে দিলেন। এমনই ছিলেন ইমামগণ।

আরও একজন তাবিয়ির কাছ থেকে ইমাম আবূ হানিফা ইলম গ্রহণ করেছেন, আতা ইবনু রবাহ (রহিমাহুল্লাহ)। তিনি আবদুল্লাহ ইবনু উমরের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আযাদকৃত গোলাম। জাতিতে হাবশী। কিন্তু বেড়ে ওঠা ও বসবাস মক্কায়। হাজ্জের সময় সকলেই তাঁর কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করত। তাঁর উপস্থিতিতে অন্য কেউই ফতোয়া দিত না। হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

কুফাবাসী আবূ হানিফা মক্কাবাসী আতার কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করতে পেরেছেন, কারণ তিনি বহু জায়গায় ইলমের সন্ধানে সফর করতেন। তারমধ্যে হাজ্জের সফরও অন্তর্ভুক্ত। কথিত আছে যে, তিনি হাজ্জ করেছেন পঞ্চান্নবার। আর ইন্তিকাল করেছেন সত্তর বছর বয়সে। তা হলে বলা যায়, পনেরো বছর বয়স থেকে তিনি প্রতিবছর হাজ্জ করেছেন। আতা ইবনু রবাহর সুউচ্চ ইলমী অবস্থান সম্পর্কে আবূ হানিফা বলেন,

ما رأيتُ فيمن لقيتُ أفضلَ من عطاء بن أبي رَباح

'যত মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তাদের মধ্যে আতা ইবনু রবাহের চেয়ে উত্তম কাউকে দেখিনি।'[১৩]

[১২] সিয়ারু আলামিন নুবালা, হুলয়াতুল আওলিয়া
[১৩] তারিখে দামেশক লি ইবনু আসাকির (৩৮৯/৪০)

ফিক্বহের পাণ্ডিত্য

ইমাম আবূ হানিফার (রহিমাহুল্লাহ) ওস্তাদগণ সকলেই বিখ্যাত ও গ্রহণযোগ্য আলিম। এটিই প্রমাণ করে যে, আবূ হানিফার ইলম সম্বন্ধে ছড়ানো প্রোপাগান্ডা কতটা অসার! পাশাপাশি হানাফি ফিক্বহ বা হানাফি মাযহাব সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার কারণও বোঝা যায় এ থেকে।

ইমাম আবূ হানিফা কোনো হাদীস পেলে তা সহিহ হলে গ্রহণ করে নিতেন। সাহাবি ও তাবিয়িগণের কোনো আমল তাঁর কাছে পেশ করা হলে, তা গ্রহণ করতেন। কোনো মাসআলার সমাধান কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি পাওয়া না গেলে করতেন ক্বিয়াস।

ইমাম আশ শাফি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে, ফিক্বহ শাস্ত্রের ব্যক্তিবর্গ ইমাম আবূ হানিফার পরিবার।

আবূ হানিফাই সর্বপ্রথম বিষয়ভিত্তিক আকারে ফিক্বহকে সাজান। ফিক্বহুস সালাত, ফিক্বহুস সাওম, ফিক্বহুয যাকাত এভাবে ভাগ করেন। এ কারণেই পরবর্তী ইমাম ও সালাফগণকে ইমাম আবূ হানিফার জন্য দুআ করতে দেখি আমরা। ফিক্বহকে মানুষের জন্য সহাজ্জবোধ্য করে তুলেছেন তিনি। সহাজ্জতর করে উপস্থাপন করেছেন মানুষের সামনে। এ রকম বহু ঘটনার উদাহরণ বিদ্যমান। যেমন :

এক লোক তার দুই ছেলেকে একই রাতে বিয়ে করায়। কিন্তু ভুলক্রমে এক ভাইয়ের স্ত্রী অপর ভাইয়ের সাথে রাত্রিযাপন করে ফেলে। লোকটি হন্তদন্ত হয়ে পরদিন সকালে মাসআলা জানতে গেল কুফার আলিমগণের কাছে। ইমাম শাতবী, সুফিয়ান আস সাওরী (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখের কাছে গিয়ে সব খুলে বলল।

সুফিয়ান আস সাওরী বললেন, 'কোনো সমস্যা নেই। এখন যে যার আসল স্বামীর কাছে চলে গেলেই হবে।' ইমাম আবূ হানিফা চুপচাপ ছিলেন। কেউ একজন বলল, 'আবূ হানিফা, আপনি কিছু বলুন।' ইমাম আবূ হানিফা লোকটিকে বললেন তার দুই ছেলেকে নিয়ে আসতে। লোকটি তাদেরকে নিয়ে এলে ব্যক্তিগতভাবে দুজনের সাথেই কথা বলেন তিনি।

তাদেরকে আলাদা আলাদা জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে তুমি তোমার ভাইয়ের স্ত্রীর

সাথে রাত্রিযাপন করলে, এতে কি মনে কোনো অস্বস্তি অনুভূত হচ্ছে?' তারা উভয়েই বলল, 'না, কিছুই মনে হচ্ছে না।' এরপর ইমাম বললেন, 'যদি তোমাকে বলা হয় তোমার ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করতে, রাজি হবে?' তখনও তারা উভয়েই ব্যক্তিগতভাবে রাজি হয়। ইমাম আবূ হানিফা তাদের পিতাকে ডেকে বললেন, 'উভয়েই তাদের আসল স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে। এরপর যে যার সাথে রাত্রিযাপন করেছে, তাকে তার সাথে নতুন করে বিয়ে দিন।'

এটাই ছিল ইমাম আবূ হানিফার সমাধান। মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝতেন তিনি। তাই তিনি উভয়ের স্ত্রীকে উভয়ের সাথে মেশার সুযোগ না দিয়ে ভুলক্রমে হয়ে যাওয়া স্ত্রীর সাথে নতুন করে বিয়ে করিয়ে দিতে বলেন।

দৈহিক গড়ন ও চালচলন

ইমাম আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) দেখতে শুনতেও বেশ ভালো ছিলেন। মধ্যম আকৃতির পুরুষ; কথা বলতেন খুব সুন্দর করে গুছিয়ে। তাঁর সহাজ্জ ও সাবলীল বক্তব্যে মানুষ জটিল থেকে জটিলতর বিষয় সহাজ্জভাবে বুঝে যেত।

সব সময় ভালো মানের কাপড় পরিধান করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন নামকরা। যেহেতু তাঁদের পৈত্রিক ব্যবসাই ছিল কাপড়ের, তাই তিনি কাপড়ের গুণগত মান সম্পর্কে ভালোই অবগত ছিলেন। অনেকেই দ্বীনদারি দেখাতে গিয়ে ময়লা, পুরোনো জামা পরে চলাফেরা করে। কিন্তু ইমাম আবূ হানিফা এদিকটিতে বেশ মার্জিত রুচিবোধের অধিকারী ছিলেন। সুগন্ধি মাখতেন, পরতেন দামি পাগড়ি ও আলখাল্লা। সালাতের জন্য মাসজিদে যেতেও এমন কাপড় পরতেন, যা সাধারণত মানুষ বিয়ে-অনুষ্ঠানে পরে। বলতেন,

> 'মানুষকে দেখানোর জন্য সুন্দর জামাকাপড় পরার চেয়ে আল্লাহকে দেখানোর জন্য পরা অধিক উত্তম। আল্লাহই এর অধিক হকদার।'

অনুগত সন্তান

মানুষ বৃদ্ধ হলে শিশুদের মতো আচরণ করে। বয়সে বড় হলেও মস্তিষ্ক হয়ে যায় শিশুসুলভ। বয়সকালে এমনটাই হয়েছিল আবূ হানিফার মায়ের। তিনি একটি বিষয়ে ফতোয়া জানতে চাইলে ইমাম আবূ হানিফা ফতোয়া দেন। কিন্তু তাঁর মায়ের মনঃপূত হলো না সেটা। তিনি বললেন, 'আমাকে ইবনু যুরের কাছে নিয়ে চলো। তার কাছেই এই ফতোয়া শুনব।' ইমাম আবূ হানিফা তা-ই করলেন।

ইবনু যুরও ছিলেন ফক্বিহ। তার কাছে গেলে তিনি আবূ হানিফার মাকে বললেন, 'আপনি আমার কাছে ফতোয়া জানতে চাইছেন! অথচ আপনার ছেলে কুফার ফক্বিহ!' কিন্তু ইমাম আবূ হানিফা কিছুই বললেন না। মায়ের কথা অনুযায়ী ইবনু যুরের ফতোয়া মেনে নেন তিনি। কারণ, অনেকসময় অনেক কিছু ভুল মনে হলেও সম্মানের খাতিরে মেনে নিতে হয়।

লেনদেনে বিশ্বস্ততা ও দানশীলতা

যেহেতু ইমাম আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) নিজেই নিজের জীবিকা উপার্জন করতেন, তাই ইলম অর্জনের সময়ও কাপড়ের ব্যবসা চালু রেখেছিলেন তিনি। কুফায় তাঁর কাপড়ের দোকান বেশ প্রসিদ্ধ। সব জায়গা থেকে মানুষ তাঁর দোকানে আসত কাপড় কেনার জন্য। কারণ ইমামের দোকানের কাপড় ভালো মানের।

আবূ হানিফা নিজেও বসরা-সহ আরও অনেক শহরে কাপড়ের ব্যবসার খাতিরে সফর করতেন। একজন অংশীদারও ছিল তাঁর ব্যবসায়। কারণ, ইলম অর্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্য পুরোদমে একসাথে করা সম্ভব নয়। তাই তিনি ব্যবসায় অংশীদার রাখেন। নিজে ব্যবসায় সময় দিতেন প্রাত্যহিক ফজরের পর দুই কি তিন ঘণ্টা।

খুবই আমানতদার ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। কোনো কাপড়ে খুঁত থাকলে অংশীদারকে বলে দিতেন, যেন সে উক্ত খুঁতের কথা খদ্দেরকে জানিয়ে কাপড় বিক্রি করে। তাঁর অংশীদারও ছিলেন সৎ। কিন্তু ভুলক্রমে একদিন তিনি খুঁতের কথা বলতে ভুলে যান। কাকে বিক্রি করা হয়েছে, তাও মনে করা যাচ্ছিল না। তাই ইমাম আবূ হানিফা সেদিনকার সকল খদ্দেরের মূল্য ফিরিয়ে দেন। উদ্দেশ্য, নিজের উপার্জন সম্পূর্ণ

হালাল রাখা। তিনি দরিদ্রদের কাছ থেকে কাপড়ের মূল্য কমিয়ে রাখতেন বটে। কিন্তু ধনীদের কাছ থেকে বাড়িয়েও নিতেন না।

পাশাপাশি তিনি ছিলেন দানশীল ও উদার। ব্যবসা-বাণিজ্যে যা লাভ হতো, তার সবই তাঁর ছাত্রদের ভরণপোষণ ও ফকিহদের পেছনে ব্যয় করতেন। টাকা বণ্টন করার সময় বলতেন, 'দেখো, এই টাকা আমার দান নয়। বরং আল্লাহ তাআলা আমার মাধ্যমে তোমাদের প্রাপ্য তোমাদেরকে দান করছেন। সুতরাং, তোমরা আমাকে ধন্যবাদ জানাবে না। আল্লাহ না চাইলে কেউ কাউকে কোনো রিযক দিতে পারে না।'

তাঁর দেখাদেখি অন্যান্য আলিমও এই মূলনীতি অনুসরণ শুরু করেন। এজন্য আর্থিকভাবে সাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন। আর্থিক সক্ষমতা তৈরি হলে মানুষ দান করতে পারে।

ইমাম আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানে লাভবান। দুনিয়ায় তিনি আর্থিকভাবে সক্ষম ছিলেন। আর আখিরাতের কথা তো বলাই বাহুল্য।

অতুলনীয় দ্বীনদারি

ইমাম আবূ হানিফার (রহিমাহুল্লাহ) দ্বীনদারি সর্বজনবিদিত। বহু ঘটনা আছে, যা তাঁর চূড়ান্ত দ্বীনদারির প্রমাণ। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহিমাহুল্লাহ) এবং ইয়াহইয়া ইবনু হারুন (রহিমাহুল্লাহ) আবূ হানিফার বুযুর্গী নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন।

দুটি ঘটনা বর্ণনা করা হলো,

একবার ইমাম আবূ হানিফাকে তাহাজ্জুদ পড়তে দেখল এক লোক। তিনি সালাতে সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করছিলেন। একপর্যায়ে এই আয়াতে পৌঁছালেন,

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنۡيَا حَسَنَةً وَّفِى الۡاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।'[১৪]

---

[১৪] সূরা বাকারাহ (২০১)

বর্ণনাকারী বলেন, 'তিনি এই আয়াত বারবার তিলাওয়াত করতেই থাকলেন। এমনকি ফজরের আযানের আগপর্যন্ত এই আয়াত তিলাওয়াত করেই গেলেন।'

আরেকটি ঘটনা হলো,

ইয়াযিদ ইবনু কুমাইত বলেন, একবার ইমাম আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) মাসজিদে মুয়াযযিনের পেছনে ইশার সালাত আদায় করলেন। সালাতে সূরা যিলযাল তিলাওয়াত করলেন মুয়াযযিন,

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

'পৃথিবীকে যখন ভীষণভাবে প্রকম্পিত করা হবে, যখন ভূমি তার বোঝা বের করে দেবে, আর তখন লোকেরা বলবে, তার কী হলো? সেদিন তার সকল খবর বলবে। তা একারণে যে, তার রব তাকে এরূপ আদেশই দেবেন। মানুষ সেদিন দলে দলে বিভক্ত হয়ে বের হবে, যাতে নিজের আমলের প্রতিফলন দেখতে পায়। অতঃপর অণু পরিমাণ নেক আমলকারীও তা অবলোকন করতে পারবে, আর অণু পরিমাণ বদ কাজ করলেও তা দেখতে পাবে।'

সালাত শেষ হয়ে গেল। মাসজিদ থেকে বের হয়ে গেল মুসল্লিরা। মাসজিদে কেবল মুয়াযযিন ও ইমাম আবূ হানিফা।

মুয়াযযিন বর্ণনা দিচ্ছেন, 'ইমামকে দেখলাম, গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছেন এবং হাঁপাচ্ছেন। মাসজিদ থেকে বের হয়ে গেলাম একটু পর। টিমটিম করে একটা তেলের বাতি জ্বলছিল ভেতরে। তাতে খুব অল্প তেল বাকি ছিল। ফজরের সময় এসে দেখলাম ইমাম তখনও তাঁর জায়গায় স্থির হয়ে বসে এই কবিতা আবৃত্তি করছেন,

يا من يجزي بمثقال ذرة خير خيرًا،

ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شرًا،

أجر النعمان عبدك من النار وممّا يقرب منها من السوء،
وأدخله في سعة رحمتك

হে কণা পরিমাণ সৎকাজের বিনিময়দাতা সত্তা,

ওহে কণা পরিমাণ মন্দকর্মের পরিণামদাতা সত্তা

আপনার বান্দা নু'মানকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন, আরও রক্ষা করুন তার কাছাকাছি অন্যান্য অকল্যাণ থেকে। এবং তাঁকে আপনার রহমতের প্রসারতায় জায়গা দিন।

ইমাম সারারাত এই কথাগুলো বলে বলে কাটিয়ে দিয়েছেন। ফজরের সময় এসে দেখি তখনও বাতি নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে। আমাকে দেখে ইমাম আবূ হানিফা বললেন, "বাতি নিয়ে যাবে?" কারণ, তিনি মনে করেছিলেন তখনও ইশার ওয়াক্ত রয়ে গেছে। আমি বললাম, "ফজর হয়ে গেছে তো, ইমাম সাহেব।" তা শুনে ইমাম আবূ হানিফা বললেন, "ওহ। আচ্ছা, যা দেখেছ তা গোপন রাখবে।" এরপর তিনি ইশার ওযু দিয়েই ফজরের সুন্নত আদায় করে ফজরের সালাত আদায় করার জন্য বসে পড়েন। আর আমি এই ঘটনা ইমামের মৃত্যুর আগপর্যন্ত কাউকে বলিনি।'[১৮]

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

'অনেকেই ছিল, যারা ইমাম আবূ হানিফাকে অপছন্দ করত, গালি দিত। কিন্তু তিনি কখনোই তাদের সম্পর্কে অন্যদের সামনে পালটা কিছু বলতেন না। গীবত করতেন না।'

কেউ মারা গেলে তার পরিবারে টাকা পয়সা দান করে আসতেন তিনি, এমনকি সে তাঁর নিন্দুক ও সমালোচক হলেও। ইমাম আবূ হানিফাকে জারজ বলে গালি দিয়েছিল এক লোক। কিন্তু ইমাম (রহিমাহুল্লাহ) তাকে কিছুই বলেননি।

সুফিয়ান আস সাওরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

هو والله أعقل من أن يسلّط على حسناته ما يذهب بها

[১৮] তারীখে বাগদাদ (১৩/৩৫৫), আল ওয়াফি বিল ওয়াফিয়াত

'আল্লাহর কসম, ইমাম আবূ হানিফা খুব চালাক। গীবত করলে নিজের সওয়াব চলে যাবে, তাই গীবত করেন না তিনি।'[১৬]

প্রখর বুদ্ধিমত্তা

رجل بالكوفة يقول: عثمان بن عفان كان يهوديًا، فأتاه أبو حنيفة، فقال: أتيتك خاطبًا، قال: لِمَن؟ قال: لابنتك، رجل شريف غني بالمال، حافظ لكتاب الله، سخيٌّ يقوم الليل في ركعة، كثير البكاء من خوف الله، قال: في دون هذا مقنع يا أبا حنيفة، قال: إلا أن فيه خَصلة، قال: وما هي؟ قال: يهوديٌّ، قال: سبحان الله! تأمرني أن أزوج ابنتي من يهودي، قال: لا تفعلُ؟قال: لا، قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه من يهودي؟! قال: أستغفر الله؛ إني تائب إلى الله عز وجل

কুফায় একবার এক লোক হযরত উসমান ইবনু আফফানকে (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ইয়াহূদীর সন্তান বলে প্রচার করতে লাগল। এ কথা শুনে তার কাছে এলেন আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ)। এসে বললেন, 'একটা বিয়ের প্রস্তাব এনেছি।'

লোকটি বলল, 'কার জন্য?'

'তোমার মেয়ের জন্য। যার পক্ষ থেকে এসেছি, সে খুবই ভদ্রলোক। সম্পদশালী, হাফিজ, দানশীল, তাহাজ্জুদগুজার, আল্লাহর ভয়ে প্রচুর কাঁদে।'

'আবূ হানিফা, আমি রাজি।'

'তবে একটা সমস্যা আছে।'

'কী?'

'সমস্যা হলো, যার পক্ষ থেকে এসেছি সে ইয়াহূদী।'

[১৬] তারীখে বাগদাদ লিল খতিব আল বাগদাদী (১৩/৩৬৩)

তখন লোকটি ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'সুবহানাল্লাহ, আপনি আমাকে একজন ইয়াহূদীর কাছে আমার মেয়ে বিয়ে দেয়ার জন্য বলছেন!'

ইমাম আবূ হানিফা বললেন, 'তুমি দেবে না?'

সে বলল, 'কখনোই না!'

তখন আবূ হানিফা বললেন, 'তা হলে তুমি কীভাবে বলতে পারলে যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই কন্যাকে একজন ইয়াহূদীর কাছে বিয়ে দিয়েছেন?'

লোকটি তারপর ইস্তিগফার করে আল্লাহর কাছে তাওবা করে।[১৭]

ইমাম আবূ হানিফা চাইলে লোকটার সাথে তর্ক করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা করেননি। তাকে এমন এক পদ্ধতিতে বুঝিয়ে দিলেন, যাতে সে মনেপ্রাণে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

কৌতুকবোধ

ইমাম আবূ হানিফা ﵀ বেশি গম্ভীর লোক ছিলেন না। কৌতুক করতে পছন্দ করতেন তিনি। তবে মিথ্যা বলে হাসানোর মতো কৌতুক না। সেখানেও শিক্ষা থাকত। তাঁর একটি কৌতুক বলা যাক।

তাঁর এলাকায় এক কট্টর শিয়া বসবাস করত। শিয়ারা হযরত আলির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রতি ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে। আবূ বকর, উমর, উসমান, আয়েশাকে (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ঘৃণা করে, বিদ্বেষ পোষণ করে তাঁদের প্রতি। অনেক আলিম বলেছেন, যারা শিয়ায়দেরকে অপছন্দ করবে না, তারা মুসলিম থাকবে না।

তো ইমাম আবূ হানিফার এলাকার শিয়া লোকটির দুটি গাধা ছিল। সে একটির নাম রাখে আবূ বকর, অপরটির উমর (নাউযুবিল্লাহ)। তার উদ্দেশ্য ছিল, আবূ বকর ও উমরকে (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) অপমান করা। একদিন দুই গাধার একটি ওই শিয়া

[১৭] তারীখে বাগদাদ লিল খতিব আল বাগদাদী (১৩/৩৬৪)

ব্যক্তির মাথায় এত জোরে লাথি মারে যে, লোকটি মারাই গেল। আবূ হানিফা এই ঘটনা শুনে বললেন,

'ওইটা নিশ্চয়ই উমর নামের গাধাটা।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ঘটনা সত্যিই। ওই গাধার নাম উমরই বটে!

ইন্তিকাল

প্রজ্ঞা ও জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ে ইলমের প্রশস্ততার কারণে ইমাম আবূ হানিফা সরকারি পদের যোগ্য ছিলেন। কিন্তু সরকারি কোনো পদ গ্রহণ করেননি তিনি। কারণ, জুলুমবাজ শাসকের পক্ষে কাজ করা তাঁর অপছন্দের। সেসময় আরও অনেক আলিম ছিলেন, যারা সরকারি পদে কর্মরত। কিন্তু ইমাম আবূ হানিফার বক্তব্য ছিল, আলিমদের ওই মুহূর্তে সরকারি পদ গ্রহণ করা উচিত নয়।

শাসকগোষ্ঠী সারাক্ষণ ইমাম আবূ হানিফাকে (রহিমাহুল্লাহ) হাত করতে চাইত। প্রস্তাব করত ঘুষ, পদ-সহ সবকিছুই। কিন্তু ইমাম আবূ হানিফা সব সময় প্রত্যাখান করতেন এসব।

তাঁকে একবার খেলাফতের পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতি হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। যথারীতি তা ফিরিয়ে দেন তিনি। দ্বিতীয়বার দেওয়া হলে দ্বিতীয়বারেও ফিরিয়ে দেন। শপথ করে বলেন যে, জীবনেও তা গ্রহণ করবেন না। খলীফার প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় তাঁকে গ্রেফতার করে দৈনিক দশবার বেত্রাঘাত করা হতো।

কুফার প্রশাসন তাঁকে হত্যা করতে চাইলে তিনি কুফা থেকে নয়-দশ বছরের জন্য পালিয়ে মক্কায় চলে যান, যেন শাসক পরিবর্তন হলে ফিরে আসতে পারেন। কিন্তু এরপরেও 'কাযিউল কুযাত' বা প্রধান বিচারক পদের প্রস্তাব দেওয়া হয় তাঁকে। তিনি এবারেও প্রত্যাখান করেন।

তখন খলীফা বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আপনাকে বিচারপতি হতেই হবে।' ইমাম আবূ হানিফাও পালটা জবাব দেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি কিছুতেই বিচারপতি হব না।'

খলীফা আবূ জাফর আল মানসুর এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

কিন্তু এতে জনগণ চলে গেল খলীফার বিপক্ষে। জনগণের মধ্যে আবূ হানিফার প্রভাব দেখে ভীত হয়ে খলীফা কারাগারের মধ্যেই ইমামকে জোরপূর্বক বিষপান করিয়ে হত্যা করেন; রহিমাহুল্লাহু রহমাতান ওয়াসিআন।

পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি লোক উপস্থিত হয় ইমাম আবূ হানিফার জানাযায়। আল্লাহ তাআলা এই মহান ইমামের ওপর রহম করুন। তাঁকে দান করুন জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা। আমাদের সকলকে তাঁর গুণাবলি ধারণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হিজরত-ভূমের ইমাম

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ)

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্যতম একজন ইমাম হলেন ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ)। তাঁর উপাধি 'ইমামু দারিল হিজরত', তথা হিজরতের ভূমির ইমাম। হিজরতের ভূমি হলো আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর মদীনাতুল মুনাওয়ারাহ। এই শহরের সাথে সম্পর্কিত করে ইমাম মালিক ইবনু আনাসকে ইমামু দারিল হিজরত বলা হয়।

তাঁর পুরো নাম আবূ আবদুল্লাহ মালিক ইবনু আনাস ইবনু মালিক ইবনু আবী আমির ইবনু আমর ইবনু হারিস ইবনু গাইমান ইবনু হুসাইল ইবনু আমর ইবনু হারিস। মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরি ৯৩ সনে যিলমারওয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তখন সুলায়মান ইবনু আবদিল মালিকের খেলাফতের সময়কাল। এ বছরই ইন্তিকাল করেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম প্রসিদ্ধ সাহাবি হযরত আনাস বিন মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। ইমাম মালিকের পিতা আনাস ইবনু আমের যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য তির বানাতেন। এটাই ছিল তাঁর পেশা। তাঁর মাতা ছিলেন আলিয়াহ বিনতে শারিক আল আযদিয়্যাহ। আল্লাহ তাআলা তাঁদের উভয়ের ওপর রহম করুন।

মায়ের বেটা

ইমাম মালিকের (রহিমাহুল্লাহ) মা তাঁকে বালক বয়স থেকেই আলিমদের মতো পোশাক পরাতেন। বর্তমানে যেমন আলিমগণ বিশেষ ধরনের পোশাক পরেন, তখনও এমন চল ছিল। আলিয়াহ (রহিমাহাল্লাহ) চাইতেন তাঁর সন্তানও একজন বড় আলিম হোক। তাই মালিক ইবনু আনাসকে বালক বয়স থেকেই পাগড়ি, আলখাল্লা

পরিয়ে দিতেন তিনি। এটিই আসলে তারবিয়াহ, সঠিক লালনপালন। ইমাম মালিকের ইমাম মালিক হয়ে ওঠার পেছনে তাঁর মায়ের অবদান অনেক।

মজার ব্যাপার হলো, মালিক ইবনু আনাস কিন্তু জীবনের শুরুতে আলিম হতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন গায়ক হতে। মায়ের ইচ্ছে ভিন্ন। তিনি তো চাইলেই ছেলেকে বলতে পারতেন, 'কী! তুই গায়ক হবি? এত বড় সাহস! কিছুতেই এটা হতে দেবো না। জানিস, গান-বাজনা কত খারাপ?' ইত্যাদি ইত্যাদি। ইমাম মালিকও উত্তরে বচসা করতে পারতেন, 'না, তোমার কথা শুনব না। আমি গায়ক হবই।' কিন্তু উভয়ের কেউই তা করেননি।

মালিকের মা তাঁকে বললেন,

> **'দেখো, গায়কদের চেহারা সুন্দর হতে হয়। গান গাওয়ার সময় শ্রোতারা গায়কের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখতে সুন্দর না হলে গানও পছন্দ করে না। তুমি তো সুশ্রী নও। তাই গায়ক হবার চিন্তা বাদ দাও। ইলম শেখো, বড় আলিম হও।' মালিক ইবনু আনাস ভাবলেন, 'হ্যাঁ, কথা তো সত্য। থাক, গানের চিন্তা বাদ দিই। ইলম অর্জন করি।'**

গানের প্রতি নিরুৎসাহিত করতে মা অসুন্দর বললেও বাস্তবে কিন্তু ইমাম মালিক অসুন্দর ছিলেন না। সত্যিই সুন্দর ও রূপবান পুরুষ ছিলেন তিনি। তারপরও মায়ের কথা তাঁর মাঝে প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর কথা আমলে নিয়ে গান ছেড়ে দেন। মনোনিবেশ করেন ইলম অর্জনে।

এটা আলিয়াহর (রাহিমাহাল্লাহ) প্রজ্ঞার পরিচয়। তিনি রূঢ়ভাবে নিষেধ করার পরিবর্তে এমন কিছু বলেছেন, যা ইমাম মালিকের মাথায় গেঁথে যায়। এরই বদৌলতে আমরা পেয়েছি এক মহান ইমাম। ইসলামের এক মহান সেবক। ইমামু দারিল হিজরত ইমাম মালিক ইবনু আনাস রহিমাহুল্লাহ।

শিক্ষকদের সাহচর্যে

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ) দশ বছর বয়সে ইলম অর্জন করতে শুরু করেন। প্রায় নয়শ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি। ইমাম যাহাবির (রহিমাহুল্লাহ) সিয়ারু আলামিন নুবালা-সহ আরও যত জীবনীগ্রন্থ আছে, সেখানে ইমাম মালিকের বহু শিক্ষকের নাম আছে, আবার অনেকের নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে সংখ্যাটা এমনই হবে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন :

ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম আল আওযায়ী, ইমাম সুফিয়ান আস সাওরি, ইমাম সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহিমাহুমুল্লাহ)। উল্লেখিত সকলেই ইমাম মালিক ইবনু আনাসের সমসাময়িক।

ওস্তাদ ইবনু হরমুজ

ইমাম মালিকের অনেক শিক্ষকের মধ্যে একজন বিশিষ্ট শিক্ষক ছিলেন ইবনু হরমুজ (রহিমাহুল্লাহ)। উল্লেখ্য, ইলম শেখার একটি সার্বজনীন মূলনীতি আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও আলেমগণের ইতিহাসে পাওয়া যায় এই মূলনীতিটি। তা হলো,

باب الشيخ لا يطرق

'শাইখের দরজায় টোকা দেয়া যাবে না।'

অর্থাৎ, শিক্ষকের কাছে গিয়ে সরাসরি তাঁর দরজার কড়া নাড়া আদবের খেলাফ। শিক্ষককে ডেকে বাইরে আনা যাবে না। তিনি নিজের সময়মতো বেরিয়ে এসে ইলম বিতরণ শুরু করবেন। বর্তমানে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে আদব নামক বিষয়টিই হয়ে গেছে অপ্রাসঙ্গিক। সে যুগে ইলম অর্জন করতে কোনো শায়খের কাছে গেলে আদবই ছিল মুখ্য।

যেমন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যখন হাদীস সংগ্রহ করতে অন্যান্য বয়স্ক সাহাবির কাছে যেতেন, তখন কখনোই নিজ থেকে তাঁদেরকে

ডাকতেন না। বসে থাকতেন দরজায়। দুষ্ট বালকেরা তাঁর গায়ে মুখে মাটি, ধুলোবালি ছুড়ত। তিনি সফর করে ধুলিধুসরিত মুখ নিয়ে অপেক্ষা করতেন কখন সাহাবি বেরিয়ে আসবেন এবং তিনি হাদীস জেনে নিবেন।

ইমাম মালিকও ছিলেন এই মূলনীতির অনুসারী, সেই দশ বছর বয়স থেকেই।

শীতকালে মদীনা মুনাওয়ারাহ প্রবল হিমবাতাসের কারণে জমে পাথর হয়ে যায়। শৈত্যপ্রবাহের কারণে বাইরে বের হওয়া দায়। এর মাঝেও ইমাম মালিক ভোরে ইবনু হরমুজের দরজায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইতেন। এমনই ছিল তাঁর আদব। ইমাম মালিক নিজেই বলেন,

وكان يقول: وكنت آتي ابن هرمز بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل.

'আমি ভোরে ইবনু হরমুজের কাছে আসতাম। রাত অবধি বের হতাম না তাঁর বাড়ি থেকে।'[১৮]

তিনি আরও বলেন, 'ইবনু হরমুজের ঘরের সামনে ঠান্ডা পাথরে বসে থাকতাম আমি। পায়জামা পাথরের হিমে ভিজে যেত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অপেক্ষায় থাকতাম কখন ইবনু হরমুজ সালাতের জন্য কিংবা অন্য কোথাও যেতে বের হয়ে আসবেন, আর আমি ইলম অর্জন করব সেই সুযোগে।'

বয়সকালে অন্ধ হয়ে যান ইবনু হরমুজ। তখন ইমাম মালিক তাঁকে ঘর থেকে মাসজিদে আনা-নেওয়া করতেন। আরও যেখানে যাওয়া প্রয়োজন হতো, সেখানেও নিতেন। ইলম অর্জনের জন্য এই ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন ইমাম মালিক। আনা-নেওয়ার সময়টুকু নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নিতেন।

[১৮] তারতিবুল মাদারিক ওয়া তাকরিবুল মাসালিক (৩২/১)

ওস্তাদ আন নাফে

ইমাম মালিকের আরেকজন শিক্ষক আন নাফে (রহিমাহুল্লাহ)। তিনি আবদুল্লাহ ইবনু উমরের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর) আজাদকৃত গোলাম। আন নাফের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল অযথা কারও সাথে কথা না বলা। দারসগাহের বাইরে কারও কোনো প্রশ্নেরও উত্তর দিতেন না তিনি। দারসের সময় নির্ধারিত, স্থান নির্ধারিত। কিছু জানতে হলে ওইটুকু সময়ের মধ্যে দারসগাহতেই জেনে নিতে হবে। কোনো কারণে আসতে না পারলে অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী দারসের জন্য। সময় শেষ মানে সোজা বাড়িতে। খানিকটা বদমেজাজিও ছিলেন আন নাফে।

স্বভাবতই আন নাফের দারসগাহে সব সময়ই ভিড় লেগে থাকত। শত শত হাজার হাজার শিক্ষার্থী, ভক্ত ঘিরে রাখত তাঁকে। তাঁর কাছাকাছি যাওয়ার সাধ্য ছোট্ট বালক ইমাম মালিকের হতো না; বরং ভিড়ে ঢুকলে হারিয়েই যাবেন তিনি। ওদিকে আন নাফে দারসগাহের বাইরে কথাও বলতেন না। তাই ইমাম মালিক একটি বুদ্ধি আঁটলেন। আদবের পরিপন্থি কোনো ফন্দি নয়, এই বুদ্ধি ইলম অর্জনের বুদ্ধি।

আন নাফেকে ধরতে তাঁর বাড়ির সামনে বসে থাকতেন ইমাম মালিক। সকালে ঠান্ডা হলেও দুপুর হতে হতে মরুভূমির বালি তেতে ওঠত। আবহাওয়া হয়ে যেত খুবই রুক্ষ। প্রচণ্ড তাপদাহে অশান্ত হয়ে যেত মদীনা মুনাওয়ারাহ। যোহরের সময় সেই প্রচণ্ড গরমেও ইমাম মালিক বসে থাকতেন নাফের গৃহের সামনে। ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

كنت آتي نافعا نصف النهار وما تظلني الشجرة من الشمس ، أتحين خروجه فإذا خرج أدعه ساعة كأني لم أره ، ثم أتعرض له فأسلم عليه وأدعه ، حتى إذا دخل أقول له : كيف قال ابن عمر في كذا وكذا ، فيجيبني ، ثم أحبس وكان فيه حدة ".

'আমি দুপুরের দিকে নাফে এর কাছে আসতাম। গাছের ছায়াও পেতাম না প্রখর রোদে। বসে থাকতাম কখন মাসজিদে যেতে বের হবেন তিনি। তিনি সালাতের জন্য বের হলে আমি পেছনে পেছনে এমনভাবে চলতাম, যেন তাঁকে দেখিইনি। তাঁকে বুঝতে দিতাম না যে, অনুসরণ করছি। স্বাভাবিকভাবেই যেতাম। এরপর

এগিয়ে গিয়ে সালাম দিয়ে ছেড়ে দিতাম। তিনি মাসজিদে ঢোকার পর গিয়ে বলতাম, "আচ্ছা, অমুক-অমুক বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কী বলেছেন?" তিনি একটি প্রশ্নের উত্তর দিলেই একেবারে জেঁকে ধরতাম তাঁকে। আর তাঁর মধ্যে ছিল ক্ষুরধার মেধা।'[১৯]

সালাম দিলে তো যে কেউই উত্তর দেবে। যতই কথা না বলুক, সালাতের পর মাসজিদ থেকে বেরিয়ে কেউ সালাম দিয়ে অবস্থা জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেওয়া স্বাভাবিক। ইমাম মালিকের বুদ্ধিটা ছিল এখানেই। সালামের উত্তর পেলে কথায় কথায় বলে বসতেন, 'শায়খ, একটা হাদীসের কথা বলেছিলেন। একটা প্রশ্ন এসেছে মনে।' অথবা, 'শায়খ, এই মাসআলার সমাধান কী?' স্বাভাবিক কথার তালেই উত্তর দিয়ে যেতেন আন নাফে (রহিমাহুল্লাহ)। ওদিকে ইমাম মালিকেরও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল।

ওস্তাদ ইবনু শিহাব আয-যুহরি

ইমাম ইবনু শিহাব আয-যুহরি (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন ইমাম মালিকের (রহিমাহুল্লাহ) আরেকজন হাদীস-শিক্ষক। আয-যুহরির ওখানেও সব সময় ভিড় লেগে থাকত। ইমাম মালিক একা পেতেন না তাঁকে। তাই এখানেও একটি বুদ্ধি খাটালেন তিনি। একবার ঈদের দিনে তিনি ইমাম ইবনু শিহাব আয-যুহরির সাথে সাক্ষাৎ করতে যান।

সাধারণত আমাদের ঈদের দিন কাটে আনন্দ-ফূর্তি করে। আগের রাত থেকে চলে প্রস্তুতি। সকালে নতুন জামা পরে সুগন্ধি লাগিয়ে মাসজিদে যাই। বাড়িতে ফিরে এসে খোশগল্পে মত্ত হই সকলের সাথে। খাবার দাবার গ্রহণ করি। এটাই ঈদের দিনের আনন্দ। কিন্তু ইমাম মালিক ইবনু আনাস অন্য ধাতুতে গড়া।

ইমাম মালিক ইবনু আনাস নিজেই বর্ণনা করেন,

> قال قلت : شهدت العيد فقلت : هذا يوم يخلو فيه ابن شهاب فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابه ، فسمعته يقول لجاريته : انظري من في الباب . فنظرت ، فسمعتها تقول مولاك الأشقر مالك . قال أدخليه فدخلت ، فقال :

[১৯] আদ দিবাজ আল মাযহাব (১১৭)

ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك ؛ قلت : لا . قال : هل أكلت شيئا . قلت : لا . قال : اطعم قلت لا حاجة لي فيه . قال فما تريد ؟ قلت تحدثني . قال لي هات. فأخرجت ألواحي فحدثني بأربعين حديثا.قلت زدني . قال : حسبك إن كنت رويت هذه الأحاديث فأنت الحفاظ . قلت : قد رويتها . فجذب الألواح من يدي ثم قال : حدث . فحدثته بها . فردها إلي وقال : فقلت :فردها الي وقال قم فأنت من أوعية العلم

'ঈদের দিন সালাতে উপস্থিত হয়ে ভাবলাম, আজকের এই দিনে নিশ্চয়ই কেউ ইমাম ইবনু শিহাবের দারসে যাবে না। তাই সালাতের পরপরই চলে গেলাম তাঁর বাড়ি। গিয়ে দরজায় টোকা না দিয়ে বাড়ির সামনে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। শুনতে পেলাম ইমাম ইবনু শিহাব তার দাসীকে বলছেন, "বাইরে কে এসেছে, দেখো তো।' বলা হলো, "মালিক ইবনু আনাস এসেছে।" এরপর ইমাম আয যুহরি দাসীকে পাঠিয়ে আমাকে ভেতরে ডেকে নিলেন। বললেন, "তোমাকে তো সালাতের পর বাড়ি যেতে দেখলাম না। খাওয়া-দাওয়া করেছ?"

"জি না, খাইনি।", বললাম আমি।

তিনি আমার জন্য খাবার আনালে আমি বললাম, "আমি তো এখানে খেতে আসিনি।"

"তা হলে?"

تحدثني

"আমাকে হাদীস বর্ণনা করে শোনান।"

"ঠিক আছে, এসো।"

স্লেট বের করলাম আমি। এরপর ইমাম ইবনু শিহাব আয যুহরি আমাকে চল্লিশটি হাদীস সনদ সহকারে শেখালেন। শেষ হওয়ার পর বললাম,

زدني

"আরও কিছু হাদীস বলুন।"

তিনি আমাকে বললেন, "যদি এই চল্লিশটি হাদীস স্মরণে রাখতে পারো, তা হলে তুমি হাফিজুল হাদীস।" আমি বললাম যে, "আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।" ইবনু শিহাব আমার হাত থেকে স্লেট নিয়ে বললেন, "দেখি, শোনাও তো।" সবগুলো হাদীস মুখস্থ শোনালাম আমি। এরপর তিনি আমার স্লেট ফিরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "ওঠো, তুমি একজন জ্ঞানপাত্র।"'[২০]

ইমাম ইবনু শিহাবের জন্য সেটি ছিল এক আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা। ঈদের দিন সবাই যেখানে আনন্দ করছে, নতুন জামাকাপড় পরে ঘুরছে, ভালো ভালো খাবার খাচ্ছে, সেখানে এই অল্পবয়সি ছেলেটি তাঁর কাছে এসেছে হাদীস শেখার জন্য। ঈদের সালাত আদায় করে বাড়িতেও যায়নি, খাবার দিলেও খায়নি।

নিজ যোগ্যতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার

আমাদের সবার মধ্যেই এমন কিছু না কিছু যোগ্যতা থাকে, যা আমাদের একেবারে স্বকীয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা সেটা কোথায় প্রয়োগ করি। কারও হয়তো মেধা ভালো, কিন্তু শারীরিকভাবে দুর্বল। আবার কারও হয়তো শক্তসমর্থ শরীর, কিন্তু মেধাশক্তি কম। আবার কারও মেধা কম, কিন্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা ও যুক্তিবোধ ভালো। যা-ই হোক না কেন, প্রশ্ন হলো এ যোগ্যতা কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে। ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর যোগ্যতা কোথায় ব্যবহার করেছেন, তা দেখা যাক।

মাত্র ২১ বছর বয়সে ফতোয়া দেওয়ার যোগ্যতায় উপনীত হন ইমাম মালিক। কুরআন ও হাদীস থেকে গবেষণা করে মানবজীবনের কোনো সমস্যার সমাধান বা প্রশ্নের উত্তর দেওয়াকে ফতোয়া বলে। সুদীর্ঘ ইলমসাধনা ও অধ্যবসায়ের পর এই সম্মান অর্জিত হয়। একুশ বছর বয়সে সে যোগ্যতা লাভ করা রীতিমতো অকল্পনীয়।

ইমাম মালিকের যোগ্যতা কত বিস্তৃত ছিল, তা আমরা একটি হাদীস থেকে বুঝতে

[২০] তারতিবুল মাদারিক ওয়া তাকরিবুল মাসালিক

পারি। হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : «ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة »

‘অতি অবশ্যই মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ইলম অন্বেষণে আসবে। মদীনার আলিমের চেয়ে জ্ঞানী আর কোনো আলিম খুঁজে পাবে না তারা।’[২১]

এই হাদীস সম্পর্কে সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

إنه مالك بن أنس

‘হাদীসে উদ্ধৃত এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মালিক ইবনু আনাস।’[২২]

কারণ, তখন ইলমের দিক থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ইমাম মালিক ইবনু আনাসের সমকক্ষ কেউই ছিল না। তিনিই ছিলেন মদীনার শ্রেষ্ঠ আলিম। ইমাম আশ শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز

‘মালিক ও সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ না থাকলে হিজায থেকে ইলম চলে যেত।’[২৩]

হিজায বলতে আরব উপদ্বীপকে বোঝায়। মক্কা-মদীনাসহ এর আশপাশের স্থানসমূহ মিলে মূল হিজাযের ভূমি।

ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

كان مالك من حجج الله على خلقه

‘ইমাম মালিক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সৃষ্টিজগতের ওপর প্রমাণস্বরূপ।’[২৪]

---

[২১] তিরমিযি, ২৬৮০

[২২] তুহফাতুল আওয়াযি, মা রাওয়াহুল আকাবির আন মালিক

[২৩] তারতিবুল মাদারিক ওয়াতাকরিবুল মাসালিক (১/৩৬)

[২৪] আল ইনতিকা ফি ফাযায়িলিস সালাসাতিল আইম্মাহ (৩১), মাওয়াহিবুল জালীল (১/৩৫)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাঁর ইলমকে ইমাম মালিক ইবনু আনাসের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রমাণ হিসেবে রেখেছেন।

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ) নিজের সম্পর্কে বলেন,

"ما جلست حتى شهد لي سبعون شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك"

'আমি যে ফতোয়া প্রদানের উপযুক্ত, এই মর্মে সত্তরজন আলিম সাক্ষ্য দেওয়ার আগপর্যন্ত আমি ফতোয়া দিতে বসিনি।'[২৫]

যোগ্যতা আরও আগেই লাভ করেছিলেন তিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অপরাপর উলামাগণের সাক্ষ্যের জন্য অপেক্ষা করেছেন। হুট করে ফতোয়া দিতে বসে যাননি। বর্তমানের অস্থিরমনস্ক ফতোয়াবাজদের জন্য এ এক দারুণ শিক্ষা।

স্বর্ণালি সূত্র

ইমাম মালিক ইবনু আনাসের (রহিমাহুল্লাহ) সনদে বর্ণিত হাদীসকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ ধরা হয়। 'মুসতালাহুল হাদীস' তথা হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষায় 'সিলসিলাতুস যাহাব' বলে একটি কথা আছে। এর অর্থ 'স্বর্ণ সনদ'। অর্থাৎ, এর চেয়ে বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্র আর হয় না।

আমরা জানি, কুরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ সহিহ আল বুখারি। সেই বুখারিতেও কিছু হাদীসকে ইমাম বুখারি বলেছেন 'সিলসিলাতুয যাহাব'। সেগুলো ইমাম মালিক ইবনু আনাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত। ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন আন নাফে (রহিমাহুল্লাহ) থেকে, আন নাফে বর্ণনা করেছেন ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, ইবনু উমর বর্ণনা করেছেন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে।

এটিই সিলসিলাতুয যাহাব। হাদীসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সনদ। এর চেয়ে

[২৫] তারতিবুল ইসলামীয়্যাহ, আল হিলইয়াহ

নির্ভরযোগ্য সনদ আর নেই।

ছাত্রবাৎসল্য

ইমাম মালিক ইবনু আনাসের (রহিমাহুল্লাহ) ছাত্র ছিল সারা দুনিয়া জুড়ে। বিশ্বের আনাচ-কানাচ থেকে মানুষ তাঁর কাছে ইলম আহরণ করতে আসতেন। কেনই বা তা হবে না?

ইমাম মালিকের একটি বিশেষ গুণ ছিল। প্রতি সপ্তাহে তাঁর বাড়িতে সকল ছাত্রকে খাবারের দাওয়াত দিতেন তিনি।

ইলমের আমানতদারি

ইমাম মালিক ইবনু আনাসের (রহিমাহুল্লাহ) শুধু জ্ঞানই ছিল না, তার সাথে ছিল প্রজ্ঞা ও প্রবল খোদাভীতি। তাঁকে যখন কেউ এমন কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করত যা ইতঃপূর্বে কেউ উত্তর দেয়নি, তিনি সাথে সাথে উত্তর দিতেন না। বলতেন, 'অপেক্ষা করো।' তারপর অজু করে আসতেন। এরপর বলতেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' তারপর দিতেন প্রশ্নের উত্তর।

মাসআলা সাধারণত দুই ধরনের হয়। কোনো কোনোটার উত্তর ইতোমধ্যে নির্ধারিত। যেমন অজু করার নিয়ম। আবার আরেক ধরনের মাসআলা নতুন উদ্ভূত। কুরআন ও সুন্নাহ ঘেঁটে নিজস্ব চিন্তা প্রয়োগ করে উত্তর দিতে হয় এগুলোর। এই দ্বিতীয় ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে অজু করে আসতেন ইমাম মালিক। উত্তর ভুল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এতটাই ভয় করতেন আল্লাহকে।

মাসআলা সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হলে কেঁদে দিতেন তিনি। বলতেন,

ما من شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من حلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله

'হালাল-হারাম বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ তাআলার হুকুমের অংশ। এ

সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেয়ে কঠিন কাজ আর কিছুই হতে পারে না।'[২৬]

তিনি ভয় পেতেন যে, ভুলভাল ফতোয়া দিয়ে দিলে আল্লাহ তাআলার সামনে জবাবদিহি করতে হবে। নিক্ষিপ্ত হতে হবে জাহান্নামে। কিয়ামাতের দিন যখন আল্লাহ কাউকে জিজ্ঞেস করবেন, 'এটা করেছ কেন?' সে যদি উত্তরে বলে, 'ইমাম মালিক করতে বলেছিলেন, তাই।' এই ভয় তাঁকে কাবু করে ফেলত।

যেকোনো ফতোয়া দেওয়ার আগে তাই ইমাম মালিক ইবনু আনাস এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন,

اِن نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّ مَا نَحنُ بِمُستَيقِنِينَ

'আমরা কেবল অনুমান করি এবং আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী নই।'[২৭]

হাইসাম ইবনু জামিল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

كنت ذات مرة مع الإمام مالك عندما سئل أكثر من أربعين سؤالًا، وسمعته يردُّ: لا أعرف إلى اثنين وثلاثين منهم.

'একবার ইমাম মালিকের ওখানে ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে চল্লিশটির বেশি প্রশ্ন আসে। দেখলাম যে, তিনি বত্রিশটি প্রশ্নের উত্তরেই "জানি না" বলে ফিরিয়ে দিয়েছেন।'[২৮]

সুনাম রক্ষার জন্য কখনও না জেনে ফতোয়া দেননি তিনি। নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিতেন অপারগতার কথা। ইবনুল কাইয়িম আল জাওযি (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থ 'আর রায়ি'তে লিখেছেন,

لا أدري نصف العلم

'জানি না বলা জ্ঞানের অর্ধেক।'

আরও বহু সাহাবি, তাবিয়ি ও ফকিহর বক্তব্য রয়েছে এর স্বপক্ষে।

---

[২৬] তারতিবুল মাদারিক ওয়াতাকরিবুল মাসালিক, মালিক ইবনু আনাস ইমামু দারিল হিজরাহ।
[২৭] সূরা জাছিয়াহ (৩২)
[২৮] তারতিবুল মাদারিক ওয়াতাকরিবুল মাসালিক, তাযয়িনুল মামালিক।

সবজান্তা হওয়াকে নয়, সালাফগণ প্রাধান্য দিতেন খোদাভীতিকে। অপারগতা স্বীকার করা আল্লাহকে ভয় করার অংশ। এ কারণেই সালাফদের অনেকেই বলেছেন, কেউ সবকিছু মুখস্থ করে ফেললেই আলিম হয়ে যায় না। কেউ যদি সম্পূর্ণ বুখারি শরিফ মুখস্থও করে ফেলে, কিন্তু আল্লাহকে ভয় না করে, তবে সে জাহিল; আলিম নয়। আবার কেউ যদি একটি হাদীসও জানে কিন্তু আল্লাহকে ভয় করে, তবে সে আলিমদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আলিম ও সালাফগণ 'জানি না' বলতেন আল্লাহর ভয় থেকেই।

একবার মাগরেব অঞ্চল তথা মরক্কো থেকে এক ব্যক্তি একটি প্রশ্ন নিয়ে ইমাম মালিকের কাছে এলো। ইমাম মালিক ছিলেন মদীনায়। মরক্কো উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ। তখনকার দিনে তা ছিল উটে করে চার মাসের রাস্তা। এই চার মাসের পথ পুরোটা পাড়ি দিয়ে ওই ব্যক্তি ইমাম মালিক ইবনু আনাসের কাছে এসেছিল শুধু একটি প্রশ্নের উত্তর জানতে। কিন্তু ইমাম মালিকের উত্তরটি জানা ছিল না। তিনি লোকটিকে বললেন, 'কাল আসুন।' পরদিন লোকটি এসে বলল, 'উত্তর কী?' ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, 'জানা নেই।'

তখন লোকটি বলল, 'আমি এই প্রশ্ন মরক্কোর আলিমদের করেছিলাম। তাঁরা জানেন না এর উত্তর কী। তাই তাঁরা আমাকে বলেছেন, "ইমাম মালিকের কাছে যাও। পৃথিবীর বুকে ইমাম মালিকের চেয়ে বড় আলিম আর নেই।" আমি চার মাস সফর করে আপনার কাছে এসেছি উত্তর জানতে। ওদিকে তাঁরা অপেক্ষা করছেন ইমাম মালিক কী বলেন, তা জানতে। অথচ আপনি বলছেন, আপনি জানেন না! আমি আবারও চার মাস সফর করে মরক্কো যাব। মোট আট মাস পর তাদের সাথে দেখা হবে। এরপর তাঁরা জানতে চাইবেন আমি কী উত্তর নিয়ে এসেছি। কী উত্তর দেবো তাঁদের?'

'বলবেন, ইমাম মালিক এই প্রশ্নের উত্তর জানে না।'

ইলমের ব্যাপারে বিনয়

কোনো মাসআলায় ভুল করলে সেটাও নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেন ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)। ছাত্রদের একত্র করে বলতেন, 'আমি ভুল করেছি। আমার এটা বলা উচিত ছিল না; বরং বলা উচিত ছিল অন্যটা।'

ভুল স্বীকার করলে আসলে মানহানি হয় না। ইমাম মালিকের এই বিনয়ের কারণে আল্লাহ তাআলা বরং তাঁকে প্রশংসিত করেছেন। কারণ হাদীসে আছে,

من تواضع لله رفعه الله درجاته

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্তবা বাড়িয়ে দেবেন।'[২৯]

আব্বাসি খলীফা আবূ জাফর আল মানসুর একবার হাজ্জের মৌসুমে মদীনায় এসে ইমাম মালিককে ডাকলেন। ডেকে কিছু প্রশ্ন করলেন তাঁকে। ইমাম মালিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলে খলীফা আবূ জাফর মনসুর বললেন, 'আমি আপনার বইটি নিয়ে যেতে চাই সাথে করে।'

যে বইয়ের কথা তিনি বলছেন, তা হলো মুয়াত্তা মালিক। ইমাম মালিকের কালজয়ী হাদীস সংকলন গ্রন্থ। এখানে তিনি অনেকগুলো হাদীস বিশুদ্ধ সনদে সংগ্রহ করে ফিক্বহ অনুযায়ী অধ্যায় বিন্যস্ত করেছেন। এই গ্রন্থ সংকলন করতে তাঁর সময় লেগেছে এগারো বছর।

খলীফা আবূ জাফর আল মানসুর বললেন, 'এই বইটি আমি নিয়ে যেতে চাই। এর অনেকগুলো অনুলিপি করে ছড়িয়ে দেবো সারা মুসলিম বিশ্বে। মুয়াত্তা মালিকই হবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য হাদীসের মানদণ্ড। সবাইকে তা অনুসরণ করতে হবে। অন্য আলিম ও মুহাদ্দিসগণের হাদীস বাদ যাবে।'

এই সিদ্ধান্তের যথেষ্ট কারণ ছিল। মুয়াত্তা মালিকের সব হাদীসের সনদ মদীনার লোকদের। ইমাম মালিকের ভাষ্যমতে, মদীনার লোকেরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসবাস করেছে। তাই তারা অন্যদের চেয়ে বেশি

[২৯] মিশকাতুল মাসাবীহ, ৫১১৯

গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য। তাই তিনি হাদীস সন্নিবেশ করেছেন মদীনার লোকদের ইজমার ভিত্তিতে। এ কারণেই খলীফা মানসুর এত নির্ভরতার সাথে কথাটি বলেন।

কিন্তু ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ) জবাব দিলেন, 'এমনটি করবেন না, আমিরুল মুমিনীন। কারণ, মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে হাদীস শোনে, গ্রহণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তির আছে নিজস্ব চিন্তাচেতনা। এমনকি সাহাবি আজমাঈনের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) মধ্যেও বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন রকমের মতামত ছিল। তাই আপনি যদি মানুষকে সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু মালিক বিন আনাসের অনুসরণ করতে বাধ্য করেন, তবে এটি অনেক কঠিন হয়ে যাবে তাদের জন্য। সুতরাং, তাদেরকে ছেড়ে দিন। তারা যেভাবে আমল করছে, করুক। যার কাছ থেকেই হাদীস শুনছে, শুনুক। নিজেদের মতো করে শাইখ ও আলিম নির্বাচন করতে দিন তাদের। প্রতিটি দেশে আলিমগণ আছেন, তাদের সনদ আছে, বর্ণনা আছে। তাই তারা সেটাই গ্রহণ করুক, যা তারা চায়।'

এই হলো ইমাম মালিক ইবনু আনাসের (রহিমাহুল্লাহ) বিনয়ের নমুনা।

গোপন ইবাদাত

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ) গোপনে নফল ইবাদত করতেন। কারও কপালে সিজদার দাগ থাকলে লোকে তাকে অনেক বড় আবিদ মনে করে। বিশেষ করে পাথুরে জমিতে সিজদা দিলে দাগ হয় আরও বেশি। ইমাম মালিক রুমাল বিছিয়ে সিজদা দিতেন, যেন কপালে সিজদার দাগ না পড়ে। লোকে যেন আর আট-দশজনের মতোই স্বাভাবিক লোক মনে করে তাঁকে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিচল

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ) যেহেতু নবিগণের এক উত্তরসূরী, তাই তাঁকেও নবিদের মতো যুলুম নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। দাঁড়াতে হয়েছে বিচারের কাঠগড়ায়। যেমন দাঁড়াতে হয়েছিল ইমাম আবূ হানিফাকে (রহিমাহুল্লাহ)।

মদীনার লোকেরা তাদের গভর্নরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল। কারণ

জনগণের কাছ থেকে জোরপূর্বক বাইয়াত নিচ্ছিল মদীনার গভর্নর জাফর সুলায়মান। ইসলামী রাষ্ট্রে খলীফাকে বাইয়াত দিতে হয়। অন্যথায় খলীফা নিজেকে খলীফা দাবি করতে পারেন না। এই বাইয়াত হতে হয় স্বতঃস্ফূর্ত। জোরপূর্বক নয়।

জনগণ এই জোরজবরদস্তির ব্যাপারে ইমাম মালিকের কাছে ফতোয়া জানতে এলো। কিন্তু তিনি সরাসরি হারাম বললেন না। কারণ, এতে ফিতনার আশংকা থাকে। তাই তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে রূপক উত্তর দিলেন, 'কাউকে যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য জোর করা হয়, তবে তা হারাম হবে।' এ কথার মধ্য দিয়ে তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এটাই বুঝিয়ে দিলেন যে, জোর করে বাইয়াত নেওয়া হারাম। এক ঢিলে দুই পাখি।

সংবাদ পৌঁছাল জাফর সুলায়মানের কানে। সে ক্ষুব্ধ হয়ে উক্ত হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু ইমাম মালিক সেই আদেশের পরোয়াই করলেন না। উলটো সমবেত জনতার উপস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বলে দিলেন এ কথা।

ইমাম মালিককে গ্রেফতার করা হয়। দেহের কাপড় খুলে নির্মমভাবে চাবুকাঘাত করা হয় তাঁকে। রক্তে রঞ্জিত হয় সারা শরীর। তাতেও গায়ের ঝাল মেটেনি জাফর সুলায়মানের। সে ইমাম মালিককে ক্ষত-বিক্ষত দেহে গাধার পিঠে বসিয়ে শহরে ঘোরায়। মাথার চুল কামিয়ে দেয়। তাঁকে বলা হলো, 'নিজের পরিচয় দাও।' তিনি বলে ওঠেন,

ألا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، وأنا أقول: طلاق المكره ليس بشيئ

'ওহে শুনো, যে আমাকে চেনে, সে তো চেনেই। আর যে আমাকে চেনে না সে জেনে রাখুক, আমি মালিক ইবনু আনাস ইবনু আবী আমের আল আসবাহী। শুনে রাখো সবাই! আমি বলছি, জোর করে দেওয়ানো তালাক বাতিল।'[৩০]

জাফর সুলাইমানের কাছে এই সংবাদ গেলে সে নমনীয় হয়। বলে, 'ঠিক আছে, মালিককে গাধা থেকে নামিয়ে দাও।'

এসব করার একমাত্র কারণ ছিল ইমাম মালিক ইবনু আনাসের দৃঢ়তা। তারা জানত,

[৩০] আল হুলইয়া, সিয়ারু আলামিন নুবালা

ইমাম মালিক ইলম গোপন করবেন না। এজন্যই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় তাঁর ওপর। কিন্তু তিনি 'হুজুর, হুজুর' করার বদলে নির্যাতন সহ্য করেন। চাবুকের আঘাতে হন ক্ষত-বিক্ষত।

হাদীসের প্রতি অনন্য সমীহ

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসের প্রতি অসম্ভব রকমের শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁকে কেউ প্রশ্ন করতে আসলে তিনি পালটা প্রশ্ন করতেন, 'তোমার প্রশ্নটি কি হাদীসের ব্যাপারে, না ফিক্বহের ব্যাপারে?' হাদীসের ব্যাপারে হলে ঘরের ভেতরে চলে যেতেন তিনি। ভালো করে গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নতুন জামা পরে সুগন্ধি মাখতেন তাতে। যেখানে বসে হাদীস বর্ণনা করবেন, সেখানে সুগন্ধি লোবান পোড়াতেন। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তিনি হাদীস বর্ণনা করতে বসতেন। কখনও দাঁড়িয়ে হাদীস বর্ণনা করতেন না। এটা হাদীসের প্রতি অসম্মান মনে হতো তাঁর কাছে। তাই হাদীস বর্ণনা করতেন বসে বসে।

অথচ বর্তমানে আমাদের মাঝে হাদীসের প্রতি স্বাভাবিক সম্মানটুকুও নেই।

মদীনার প্রতি সমীহ

একবার ইমাম মালিক ইবনু আনাসকে (রহিমাহুল্লাহ) মদীনা ছেড়ে প্রাসাদে আসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তৎকালীন খলীফা। এই প্রস্তাব মেনে নিলে তিনি আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করতে পারতেন। কিন্তু মদীনা ছাড়তে রাজি হননি তিনি। খলীফার প্রস্তাব এই বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون

'মদীনা তাদের জন্যে উত্তম, যদি তারা জানত।'[৩১]

সারা জীবন তিনি মদীনা ছেড়ে কোথাও যাননি।

---

[৩১] সহিহ মুসলিম

তর্ক পরিহার

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ) কারও সাথে দ্বীনি বিষয়ে তর্ক করতেন না। ইমাম আশ শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর এই গুণ সম্পর্কে বলেন,

قال الإمام الشافعي : كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء، قال : أما إني على بينة من ديني، وأما أنت، فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه

'ইমাম মালিকের কাছে যখন কোনো সংশয়বাদী ব্যক্তি আসত, তিনি তাঁকে বলতেন, "আমি আমার দ্বীনের সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর বহাল আছি। আর তুমি সন্দেহ পোষণ করছ। সুতরাং আমার কাছে না এসে তোমার মতো আরেকজন সন্দেহ পোষণকারীর কাছে যাও এবং তার সাথে তর্ক জুড়ে দাও।"'[৩২]

আমাদেরও এমনটাই করা উচিত। কারণ সংশয়বাদীরা অযৌক্তিক সব প্রশ্ন করে। ইসলামের কিছু নির্দিষ্ট বিধান নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে। তাই তাদের সাথে তর্ক না করে এসকল প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়াই উচিত। তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে নিজের ঈমানেও কুপ্রভাব পড়ে।

আরেকবার এক লোক এসে ইমাম মালিককে প্রশ্ন করল,

الرَّحْمٰن علي العرش استوي

'"পরম দয়ালু আরশে অধিষ্ঠিত হলেন।"[৩৩]

এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপনি কী বলেন? এই অধিষ্ঠানের স্বরূপ কী?'

ইমাম মালিক প্রশ্ন শুনে খুবই ব্যথিত হলেন। মাথা নত করে তাকালেন মাটির দিকে। তাঁর কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। তারপর মাথা তুলে জবাব দিলেন,

الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة وأظنك من صاحب بدعة أخرجوا عني هذا المبتدع '

[৩২] সিয়ারু আলামিন নুবালা (৯৯/৮)
[৩৩] সূরা ত্বহা (৫)

'অধিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি জ্ঞাত, তার স্বরূপ অজ্ঞাত, তার প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত। আমি তোমাকে বিদআতী মনে করছি। এ বিদআতীকে এখান থেকে বের করে দাও।'[৩৪]

আল্লাহ তাআলার আরশে সমাসীন হওয়ার কাইফিয়াত বা প্রকৃতি জানতে চাওয়া বিদআত। কারণ এ নিয়ে শুধু কল্পনাই করা যায়। আর এই কল্পনা বৈধ নয়। কারণ সাহাবায়ে আজমাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) কখনও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ধরনের প্রশ্ন করেননি।

দেহসৌষ্ঠব

ইমাম মালিক ইবনু আনাসের (রহিমাহুল্লাহ) চেহারা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল খুবই সুন্দর। তাঁর সমসাময়িক একজন আলিম বলেছেন, 'আমি ইমাম মালিকের মতো সুন্দর মুহাদ্দিস আর দেখিনি।'

মূলত মুহাদ্দিসগণের চেহারা উজ্জ্বল হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেছেন,

نضَّرَ الله عبدًا سَمِع مقالتي فوعاها، فبَلَّغها مَن لَم يَسْمعها

'আল্লাহ তাআলা ওই বান্দার মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার হাদীস শুনেছে এবং তা বুঝেছে। তারপর যে শোনেনি, তার কাছে তা পৌঁছে দিয়েছে।'[৩৫]

ইমাম মালিক ছিলেন দীর্ঘাকৃতি, উজ্জ্বল ফর্সা চেহারা, সোনালি চুল, নীল চোখ ও ঘন দাড়িবিশিষ্ট। তিনি বড় বড় গোঁফ রাখতেন। ঠোঁটের ওপর নেমে আসা গোঁফ ছেটে ফেলতেন। আরবরা ততটা ফর্সা ও সোনালি চুলের হয় না। নীল চোখও হয় না তাদের। এদিক থেকে মালিক ইবনু আনাস অনন্য।

দিনে সাদা শুভ্র পোশাক পরিধান করতেন। পরতেন লম্বা বড় পাগড়ি। পাগড়িটি তাঁর দুই কাঁধ ছাড়িয়ে নিচে নেমে যেত। এই অবস্থায় মাসজিদে আসতে খুবই সুন্দর দেখাত

[৩৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা (৪১৫/৭)
[৩৫] মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী

তাঁকে।

ইমাম মালিক সবচেয়ে দামি ও সুগন্ধযুক্ত আতর ব্যবহার করতেন। পছন্দ করতেন ভালো ভালো খাবার খেতে, বিশেষ করে ফল-ফলাদি। সবচেয়ে পছন্দের ফল ছিল কলা। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, 'অন্যান্য ফল মানুষ হাতে স্পর্শ করে, মাছি উড়ে এসে বসে। কিন্তু কলা (খোসার কারণে) কেউ ছুঁতে পারে না, মাছিও বসে না। তা ছাড়া কলা জান্নাতি ফল।'

তাঁর বিরোধীদের অনেকে তাঁকে বলত, 'আপনি এমন আয়েশি জীবনযাপন করেন কেন? কেন এত ভালো কাপড় পরেন, ভালো খাবার খান?'

উত্তরে তিনি বলতেন,

> **'যুহদ থাকে অন্তরে। আল্লাহর জন্য হৃদয়কে নরম করো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যে নিয়ামাত দিয়েছেন, তা ব্যবহারও করো। আল্লাহ তাআলা নিয়ামাত দান করার পরেও যে ব্যবহার করে না, এমন অকৃতজ্ঞ বন্ধু আমার চাই না।'**

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ) নিজ ঘরে প্রবেশের সময় উচ্চস্বরে মাশাআল্লাহ বলতেন। মানুষ এর কারণ জানতে চাইলে সূরা কাহফের আয়াত তিলাওয়াত করেন তিনি,

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ

'যখন তোমার বাগানে (আরবি : জান্নাত) প্রবেশ করলে, তখন কেন বললে না, "আল্লাহ যা চান তা-ই হয় (আরবি : মাশাআল্লাহ)?"[৩৬]

আর ঘর যেহেতু দুনিয়ার জান্নাত, তাই ঘরে ঢোকার সময় মাশাআল্লাহ বলি।'

[৩৬] সূরা কাহফ (৩৯)

ইন্তিকাল

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ১৭৯ হিজরি সনে ৯২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের সময় কালিমাতুশ শাহাদাতাইন পাঠ করছিলেন তিনি। তাঁকে দাফন করা হয় জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে। বহু সাহাবি ও তাবিঈ সমাহিত আছেন সেখানে।

ইমাম মালিকের ইন্তিকালের পর আসাদ বিন মুসা (রহিমাহুল্লাহ) তাঁকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি বলেন,

رأيت مالك بن أنس بعد موته, وعليه ثياب خضر, وهو على ناقة تطير بين السماء والأرض, فقلت: يا أبا عبد الله, أليس قدّمت؟! قال: بلى، قلت: إلامَ صرت؟ قال: قدمت على ربي، وكلمني كفاحاً, وقال: سلني أعطكَ، وتمنّ عليّ أرضِك

‘স্বপ্নে দেখলাম, ইমাম মালিক সুন্দর সবুজ পোশাক পরে একটি উটনীর পিঠে বসে আসমান ও জমিনের মাঝামাঝি স্থানে উড়ে বেড়াচ্ছেন। জানতে চাইলাম, “আবূ আব্দুল্লাহ, আপনি তো ইন্তিকাল করেছেন, তাই না?” জবাবে তিনি বলেন, “হ্যাঁ। অবশ্যই।” আমি বললাম, “কোথায় গিয়েছেন তারপর?” তিনি বললেন, “আমার রবের কাছে এসেছি। আমার রব মুখোমুখি কথা বলেছেন আমার সাথে। বলেছেন, ‘আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেবো। আমার কাছে তোমার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করো, আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করে দেবো।’”’

আল্লাহ তাআলা ইমাম মালিক ইবনু আনাসকে রহম করুন। অসীম করুণাধারা বর্ষণ করুন তাঁর প্রতি। তাঁর দৃঢ়তার উত্তম বিনিময় দিন। দ্বীনের পথে আমাদেরকে রাখুন তাঁরই মতো অবিচল।

ইলম, হাজ্জ, ও জিহাদের শাইখ

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক রহিমাহুল্লাহ

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক রহিমাহুল্লাহ (৭৪০খৃঃ-৮০৩খৃঃ) হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব।

তিনি মার্ভ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এটি খোরাসানের অন্তর্ভুক্ত। ইরানের উত্তরপূর্ব অঞ্চল, প্রায় সমগ্র আফগানিস্তান, দক্ষিণ তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিচিত ছিল খোরাসান নামে। তাঁর মা ছিলেন খারেযমী কিন্তু পিতা তুর্কি বংশোদ্ভূত।

ক্ষুরধার স্মৃতিশক্তি

জন্মভূমি মার্ভে থাকাকালেই অল্প বয়সে কুরআনুল কারীম হিফজ করেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহিমাহুল্লাহ)। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় একটি ঘটনা থেকে পাওয়া যায়।

একবার এক বন্ধুর সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন তিনি। দুজনই হাফিজ। তো তারা কোনো এক স্থানে এক ব্যক্তির আলোচনা শোনার জন্য বসলেন। শুধু শোনার জন্যই। আলোচনা শেষে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বললেন, "আমি পুরো আলোচনা মুখস্থ করে ফেলেছি।"

বন্ধু বললেন, "মজা নিলি নাকি?"

"না, সত্যিই! শুনবি?"

তারপর তিনি পুরো আলোচনাটি একেবারে শব্দে শব্দে শুনিয়ে দিলেন।[৩৭]

স্মৃতিশক্তির সাথে গুনাহমুক্ত জীবনের সরাসরি সম্পর্ক আছে। এটা কেবল ইসলামী জ্ঞান মুখস্থ করার ক্ষেত্রে নয়, সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। গুনাহ যত বেশি হবে, স্মৃতিশক্তি তত দুর্বল হয়ে যাবে। ইমাম আশ শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

شكوت لوقيع سوء حفظي

فأوصني الي ترك المعاصي

فإن العلم نور من الهي

ونور الله لا يهدي للعاصي

"একদিন আমার ওস্তাদ ওয়াকীর কাছে গিয়ে নিজের স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা সম্পর্কে অনুযোগ করলাম। আমাকে গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার উপদেশ দিলেন তিনি। কারণ ইলম হলো আল্লাহর নুর। আর আল্লাহর নুর কোনো গুনাহগারকে দেওয়া হয় না।"

শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহ.) ২৩ বছর বয়সে ইরাক সফর করেন। সেসময় ইরাক ছিল জ্ঞানবিজ্ঞানের এবং ইসলামী খিলাফতের কেন্দ্র।

ইবনুল মুবারাক অনেক তাবিয়ির কাছ থেকে ইলম হাসিল করেন। এদের মাঝে ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) তাঁর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

এ ছাড়াও তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে আছেন হাম্মাদ ইবনু যায়দ, হাম্মাদ ইবনু সালামা, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ, ইবনু জুরাইহ, সুফিয়ান আস-সাওরী, শু'বা, আল-আমাশ, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ, ইবনু শুরাইহ, আল আউযাই, ইসমাঈল ইবনু আয়াশ, ইবনু আবী দি'ব, হিশাম ইবনু উর'উয়াহ, আল-জারিরি, সুলাইমান আত-তাইমি, মালিক ইবনু আনাস, লাইস ইবনু সা'দ, মা'মার ইবনু রশিদ, মা'মার ইবনু সুলাইমান,

[৩৭] তারীখে বাগদাদ (১০/১৬৪)

যাকারিয়া ইবনু ইসহাক (রহিমাহুল্লাহ আজমা'ইন) ও আরও অনেকে।[৩৮]

দুই সুন্নাতের পাবন্দ

ইবনুল মুবারাক রহ. এর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তিনি দুটি বিষয়ে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ পাবন্দ ছিলেন। প্রথমত ইলম (জ্ঞান) এবং দ্বিতীয়ত জিহাদ।

আবূ নুআইম রহ. বলেন,

> "তিনি ছিলেন হাদীস, হাজ্জ্ব এবং জিহাদের শায়খ। তাঁর আমলও ছিল বরকতময়, কথাও বরকতময়।"[৩৯]

প্রসিদ্ধ জীবনীগ্রন্থ সিয়ারু আলামিন নুবালা এর রচয়িতা ইমাম আয-যাহাবী রহ. বলেন,

> **"ইবনুল মুবারাক ইসলামী ব্যক্তিদের মাঝে সর্দারদের সর্দার। তিনি তাঁর সারা জীবন কাটিয়েছেন ইলমের সন্ধানে, আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে, এবং মানুষকে হাজ্জ্ব ও ইলম তলবে সহায়তা করে।"[৪০]**

বলা হয়ে থাকে, তিনি বছরের দশ মাস হাদীস শিক্ষাদীক্ষায় ব্যস্ত থাকতেন এবং বাকি দুই মাস জিহাদে যেতেন। কখনও চার মাস হাদীসের দরস দিতেন আর চার মাস জিহাদে কাটাতেন।

তাঁর নয়টি বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দুটি গ্রন্থ হলো কিতাবুল জিহাদ ও কিতাবুয যুহদ। জিহাদ বিষয়ে কিতাবুল জিহাদই প্রথম গ্রন্থ। এর আগে শুধু এই বিষয়ে কোনো গ্রন্থ ছিল না। পরবর্তীকালে ইমাম শাফেয়ী আরেকটি রচনা করেন।

সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ রহ. বলেন,

> **"সাহাবিদের জীবন আর আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের জীবনের মধ্যে কেবল একটিই পার্থক্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গলাভ।"**

[৩৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা (৮/৩৭৯)
[৩৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা (৮/৪০৫)
[৪০] সিয়ারু আলামিন নুবালা

কারণ আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক রহ. এর ইলমের সাথে সাহাবিদের ইলমের মিল রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম জিহাদে পিছপা হতেন না, ইবনুল মুবারাকও না।

ইলম-শাস্ত্রে মর্যাদা

আবদুল্লাহ ইবনুল ছিলেন একজন মুহাদ্দিস। প্রাজ্ঞ হাদীস বিশারদ। বহু ইমাম তাঁর ইলমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের যুগে তাঁর চেয়ে বেশি ইলম আর কেউ হাসিল করেননি।'

ইবনু হাতিম বলেন,

> **"আমার বাবাকে বলতে শুনেছি, "ইবনুল মুবারাক হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি না বাদ রেখেছেন ইয়েমেন, না মিশর, না শাম, না জাজিরাতুল আরব, না বসরা, না কুফা।"[৪১]**

ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে "আস-সাফার" (পুনঃপুন দূর-দূরান্তে ভ্রমণকারী) উপাধি দেন।[৪২]

হাদীসশাস্ত্রের অনেক বড় বড় আলিমও কিছু না কিছু সমালোচনার শিকার হয়েছেন। ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম বুখারিও (রহিমাহুমুল্লাহ) বাঁচতে পারেননি সমালোচকদের সমালোচনা থেকে। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহ.) এর হাদীস বর্ণনা এবং হাদীসের জ্ঞান নিয়ে একজনও প্রশ্ন তুলতে পারেনি আজ পর্যন্ত।

হাদীস ও ফিকহের অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে তাঁকে তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ চারজন ইমামের একজন গণ্য করা হয়। জারহ ওয়া তা'দীলের আলিমরা নিরঙ্কুশভাবে ইবনুল মুবারাককে বলেছেন শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য আর বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস।[৪৩] যে সহীহ গ্রন্থের জন্য হাদীস বাছাই করতে ইমাম বুখারি এত কড়াকড়ি করেছেন, সেখানেও আছে ইবনুল মুবারাক বর্ণিত হাদীস।

আসওয়াদ ইবনু সালিম বলেন,

---

[৪১] তাক্বাদ্দামাতুল জারহ ওয়াত তা'দীল

[৪২] তাযকিরাতুল হুফফাজ

[৪৩] আত তাবাকাতুল কাবীর (৯/৩৭৬)

"ইবনুল মুবারাক একজন অনুসরণযোগ্য ইমাম। সুন্নাহর ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান প্রখর। যে কেউ তাঁর ব্যাপারে অপমানজনক কথা বলবে, তার নিজের ইসলামই প্রশ্নবিদ্ধ।"[৪৪]

ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন রহ. বলেন,

"তিনি ছিলেন বিশ্বাসযোগ্যতায় অধিক পরিপূর্ণ একজন ব্যক্তি। সহীহ হাদীস বিশারদ। বিশ থেকে একুশ হাজার হাদীস তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন তিনি।"[৪৫]

আন নাসাঈ একজন অন্যতম হাদীস সংগ্রাহক। সিহাহ সিত্তাহর রচয়িতাদের একজন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক সম্পর্কে বলেন,

"আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের চেয়ে বেশি প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানী কেউই নেই। তাঁর চেয়ে বেশি হাদীস সংগ্রহকারীও আর নেই।"[৪৬]

শুধু গ্রন্থ সংকলন নয়। হাদীসের সনদও সংগ্রহ করতেন তিনি। এমন সব হাদীসের শরাহ করতেন, যা খুবই শক্তিশালী সনদে বর্ণিত এবং ইমামগণের দৃঢ় সমর্থনপুষ্ট।

ইয়াহইয়া আল লাইসীর বর্ণনা করেন,

"একবার ইমাম মালিক রহ. এর শহর মদীনায় আসেন তিনি। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাককে দেখে ইমাম বললেন-

"আসুন। বসুন।"

সকলেই অবাক! কারণ ইমাম মালিক খুব নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করতেন। কোনো অপরিচিত ব্যক্তির সাথে খোলাখুলি কথা বলতেন না। এরপর ইমাম মালিক ফতোয়া জিজ্ঞেস করার অনুমতি দিলেন উপস্থিত মানুষজনকে। দেখা গেল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে তিনি বাঁ-দিকে ফিরে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের দিকে ঝুঁকেন। ইবনুল মুবারাক তাঁর কানে কানে উত্তর বলে দেওয়ার পর সেই উত্তর সবাইকে জানান ইমাম মালিক। অর্থাৎ, নিজ থেকে না বলে

[৪৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা (৮/৩৯৫)
[৪৫] তাহযীবুল কামাল ফি আসমাঈর রিজাল
[৪৬] তাহযীবুত তাক্বরীব (৩৮৬-৩৮৭)

ইবনুল মুবারাকের ফতোয়া অনুসরণ করেন তিনি। ইমাম বললেন,

"এই ব্যক্তিটি (ইবনুল মুবারাক) খোরাসানের সবচেয়ে বড় আলিম এবং ফকীহ।"

আলিম ও ফকীহ হওয়া ছাড়াও তিনি ছিলেন গুণী কবি। কিন্তু এই কবিত্ব প্রতিভা ব্যয় করতেন জ্ঞানের প্রসারে। কাব্যিক ভাষায় দিতেন অনেক উপদেশ বাণী। কারণ ছন্দ, মাত্রা, অন্ত্যমিল, বা সুরবিশিষ্ট কথা সহাজ্জে মানুষের স্মৃতিতে বসে যায়। মনে থাকে সহাজ্জে।

ইলম অন্বেষণ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের একটি বিখ্যাত উক্তি,

"জ্ঞান অন্বেষণের শুরুতেই নিয়ত করবে এই জ্ঞান আল্লাহর জন্য সঁপে দেওয়ার। তারপর ইলম শ্রবণ ও অনুধাবন করবে। তারপর আমল করা শুরু করবে এবং এই ইলম ধারণ করে বিলিয়ে দেবে মানুষের মাঝে। আমলের সাথে ইলমের কার্যকরী সম্পর্ক। সুতরাং তোমার ইলম অনুযায়ী তুমি যা আমল করো না, সেই ইলম মানুষকে বলবে না।"

তিনি আরও বলেন,

"আমরা যদি দুনিয়ার জন্য ইলম অন্বেষণ করি, তবে দুনিয়া মিলবে। যত বেশি তলব করব, ততই মিলবে। কিন্তু সেটা আমাদেরকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলবে।"

তিনি আরও বলেন,

"আদব (শিষ্টাচার) হচ্ছে দ্বীনের এক তৃতীয়াংশ। কারও কাছে অনেক কুরআন-হাদীসের জ্ঞান আছে কিন্তু আদব নেই, তার দ্বীন অপূর্ণাঙ্গ...আমি বিশ বছর ইলম শিখেছি। আর আদব শিখেছি চল্লিশ বছর।"

কারণ আদব বই পড়ে শেখা যায় না। আদব শিখতে হয় অনুশীলন করে। একজন মানুষের মধ্যে আদব আসে দীর্ঘ অনুশীলনের পর। সাহাবায়ে আজমায়ীন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) আগে আদব শিখেছেন, তারপর শিখেছেন ইলম।

জিহাদে সাহসিকতা

একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব হবার পাশাপাশি ইবনুল মুবারাকের সাহসিকতাও ছিল অপরিসীম।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ সম্পর্কে বলেন-

ذروة سنامه

"ইসলাম যদি উট হয়ে থাকে, তবে সেই উটের কুঁজ হলো আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা।"[৪৭]

সুতরাং জিহাদ হলো ইসলাম সুরক্ষার সবচেয়ে মৌলিক অনুষঙ্গ।

ইবনু কাসীর তাঁর গ্রন্থ আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াতে লিখেছেন,

"ইবনুল মুবারাক ঘন ঘন হাজ্জ আর জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।"

তাযকিরাতুল হুফফাজে ইমাম আয-যাহাবী বলেন:

"তিনি মুজাহিদীনদের গর্ব, সাহসীদের নেতা। এক বছর হাজ্জে যেতেন, আর পরের বছর নিয়োজিত হতেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে।"

প্রথমবার জিহাদে গিয়ে ইবনুল মুবারাক তাঁর সহযোদ্ধাদের বলেছিলেন,

"আমরা সারা জীবন জ্ঞান আহরণ এবং ফিক্বহের তালাশে কাটিয়েছি। কিন্তু কখনও বুঝতে পারিনি যে, জান্নাতে যাবার সমস্ত দরজা যুদ্ধের ময়দানেই খোলা। অথচ সারা জীবন আমরা এটা পেছনে ফেলে রেখেছি।"

এই বলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন।

তারীখুল বাগদাদ গ্রন্থের সিফাতুস সাফওয়া থেকে তাঁর সাহসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবদাহ বিন সুলায়মান বলেন,

[৪৭] তিরমিযী, ২৬১৬

كنا سريةً مع ابن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان، خرج رجل من العدو، فدعا إلى البِرَاز، فخرج إليه رجل، فقتله، ثم آخر، فقتله، ثم آخر، فقتله، ثم دعا إلى البِرَاز، فخرج إليه رجل، فطارده ساعةً، فطعنه، فقتله، فازدحم إليه الناس، فنظرتُ، فإذا هو عبدالله بن المبارك؛

রোমানদের বিরুদ্ধে আমরা একবার আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের সাথে জিহাদে গিয়েছিলাম। দুই পক্ষ মুখোমুখি হলে এক রোমান সেনা সামনে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানায়। তখন মুসলিম শিবির থেকে একজন বেরিয়ে এসে তাঁর সাথে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু মুসলিম সৈনিকটি শহীদ হয়ে যান। এবার দ্বিতীয় জন এলেন। তিনিও শহীদ হন। এভাবে শহীদ হলেন তৃতীয়জনও।

এরপর আমাদের পক্ষ থেকে আরেক মুজাহিদ এগিয়ে গেল সামনে। ঘণ্টাব্যাপী দ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষে আমাদের মুজাহিদ রোমান যোদ্ধাকে হত্যা করে ফেলে। এরপর রোমানদের থেকে আরেকজন বেরিয়ে আসে, তাকেও হত্যা করে সে। সে নিজেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহবান জানায় এবার। আহ্বানে সাড়া দিয়ে একজন রোমান বেরিয়ে আসে। ঘন্টাব্যাপী যুদ্ধ শেষে তাকেও সে হত্যা করে। সবাই আমাদের মুহাজিদ ভাইটির চারপাশে জড়ো হতে থাকল। আমিও সেখানে ছিলাম আর দেখলাম, মুজাহিদ ভাই জামার আস্তিনে নিজের চেহারা ঢেকে রেখেছে। আমি তার আস্তিনের এক প্রান্ত ধরে টান দিতেই অবাক বিস্ময়ে আবিষকার করলাম এ আর কেউ নয়, তিনি আমাদের আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক।”[৪৮]

ইমাম আয যাহাবীর অন্য এক বর্ণনায় আছে ইবনু মুবারাক আবদাহ বিন সুলায়মানকে কসম খাইয়েছিলেন যেন তাঁর পরিচয় গোপন রাখা হয়। নিজের চেহারা দেখিয়ে বড়াই করা তো দূরের কথা। বরং তিনি বলেছেন,

“আমার পরিচয় উন্মুক্ত করে দিয়ে আমাকে লজ্জিত করলেন? আমার ভালো কাজ প্রকাশ করে দিলেন?”[৪৯]

এভাবে ইবনুল মুবারাক প্রতিটা যুদ্ধের পর আড়ালে চলে যেতেন। নিজের সাহসিকতা দেখিয়ে বেড়াতেন না তিনি। এর কারণ হিসেবে বলেন-

---

[৪৮] তারীখে বাগদাদ লিল খতিব আল বাগদাদী (৪০০/১১)

[৪৯] ছিফাতুস সাফওয়াহ (৪/১৪৫)

"আমি যার জন্য লড়াই করি, সেই মহান সত্ত্বা আল্লাহ তাআলা জানেন আমি কোথায় আছি। সুতরাং লোকে দেখল কি দেখল না, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।"

তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত উক্তিটি হলো,

رُبَّ عمل صغير تُكثِّره النية، ورُب عمل كثير تُصغِّره النية؛

"অনেক ক্ষুদ্র আমলও নিয়তের বিশুদ্ধতার কারণে বড় প্রতিদানের হক্বদার হয়ে যায়। আবার অনেক সময় অনেক বড় বড় আমলও নষ্ট হয়ে যায় নিয়ত পরিশুদ্ধ না হওয়ার কারণে।"[৫০]

ঠিক একই গুণ সাহাবিদেরও ছিল। তাঁরা নিজেদের ভালো কাজ এমনভাবে গোপন রাখতেন, যেভাবে মানুষ নিজেদের মন্দকাজ গোপন রাখে। কেউ তাঁদের ভালো কাজ প্রকাশ করে দিলে লজ্জা পেতেন। কারণ তাঁরা চাইতেন তাঁদের এই উত্তম আমলগুলো জমা থাকুক আল্লাহর জন্য।

আল্লাহকে খুশি করার নিয়ত রেখে মায়ের থালাবাসন ধুয়ে দিলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বহুগুণ বাড়িয়ে প্রতিদান দেবেন। অন্যদিকে লৌকিকতার নিয়তে হাজারো হাজ্জ্ব আর জিহাদ করেও লাভ নেই।

শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম তাঁর *Join The Caravan* বইয়ে লিখেছেন-

"ইবনুল মুবারাক রহ. জিহাদের জন্য দুই হাজার ছয়শত কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছেন।"

একবার ইবনুল মুবারাক একটা জায়গায় গিয়ে ঘোষণা দেন,

"রিবাতের দায়িত্ব পালন করবে, এমন কে আছ?"

'রিবাত' অর্থ মুসলিম ভূখণ্ডের সীমান্ত প্রহরা। উপস্থিত সকলেই প্রস্তুত হয়ে একত্র হলো। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র। সফর করার মত পাথেয় ছিল না তাঁদের। ছিল না যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার মতো অর্থ। এটা বুঝতে পেরে তিনি তাঁদেরকে বললেন,

"দেখো, আমরা সবাই সমানভাবেই খরচ করব। আচ্ছা, আমার সঙ্গে যেতে চাইলে চল। কিন্তু আগে তোমাদের নিজ নিজ সফরের খরচের টাকা আমার

---

[৫০] সিয়ারু আলামিন নুবালা

কাছে জমা দাও। আমি তোমাদের পক্ষ থেকে একত্রে খরচ করব।"

যত লোক অভিযানে যাবে, সবাই নিজ নিজ টাকার থলি এনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের কাছে জমা দিয়ে দিল। সবগুলো নিয়ে একটি সিন্দুকে রেখে দিলেন তিনি। পুরো অভিযানে এবং ফিরতি পথে তিনি সব সাথীর পরিবহন এবং খাবারের ব্যবস্থা করতে থাকলেন। একদম নিজ খরচে। অন্যদের টাকার থলেতে হাতও দিলেন না। উলটো আরও টাকা যোগ করে রেখেছিলেন একেকজনের থলেতে।

সফর শেষে খোরাসানে ফিরেই খুললেন ওই সিন্দুক। যার যার থলে তার তার কাছে ফেরত দিলেন। তাঁর নিজের যোগ করা টাকাও ছিল সেগুলোতে। যারা এক-দুই দিরহাম দিয়েছিল, তারা বিশ দিরহাম করে ফেরত পেল।[৫১]

এটা কীভাবে সম্ভব হলো? কারণ তিনি বলতেন,

"যে ব্যক্তি উত্তম নিয়ত করে, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতিটি কাজেকর্মে রহমত বাড়িয়ে দেন।"

ফুযাইল ইবনু আয়ায ছিলেন ইবনুল মুবারাকের প্রিয়বন্ধু। তিনিও মক্কার একজন সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তাঁর গল্পটাও আঁধার থেকে আলোয় আসার। যৌবনের শুরুতে তিনি ছিলেন ডাকাত। সড়কে পথচলতি কাফেলা লুট করতেন। একদিন তিনি এক মহিলার সাথে অসদুদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করার জন্য দেয়াল টপকাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর কানে আসে কুরআনুল কারীমের একটি আয়াত–

ألم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ومانزل من الحق

"এখনও কি সময় আসেনি ঈমান আনয়নকারীদের অন্তরসমূহ আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হবার?"[৫২]

এই আয়াতই হয়ে যায় তাঁর দ্বীনে ফেরার মাধ্যম। এরপর তিনি শপথ করেন যে, যত বছর তিনি বেঁচে থাকবেন, প্রতি বছর আল্লাহর স্মরণে হাজ্জ করবেন।

হাজ্জে ব্যস্ত থাকাকালে একবার ইচ্ছে হলো বন্ধু আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের কাছে

[৫১] সিয়ারু আলামিন নুবালা (৭/৩৬৮)
[৫২] সূরা হাদীদ, ৫৭:১৬।

চিঠি লেখার। ইবনুল মুবারাক তখন জিহাদে ব্যস্ত। চিঠিতে ফুযাইল তাঁকে মক্কায় আসার আহ্বান জানান। নিজের আধ্যাত্মিকতাকে পূর্ণ করার উপদেশ দেন।

উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক ফুযাইলকে একটি ঐতিহাসিক চিঠি পাঠান। চিঠিতে লেখা ছিল,

يا عابدَ الحرمين لو أبصرتَنا .. لعلمتَ أنَّكَ في العبادةِ تلعبُ

مَنْ كانَ يخضبُ خدَّه بدموعِه .. فنحورُنا بدمائِنا تَتَخْضَبُ

أوكان يتعبُ خيله في باطل .. فخيولنا يوم الصبيحة تتعبُ

ريحُ العبيرِ لكم ونحنُ عبيرُنا .. رَهَجُ السنابكِ والغبارُ الأطيبُ

ولقد أتانا من مقالِ نبيِنا .. قولٌ صحيحٌ صادقٌ لا يَكذبُ

لا يستوي غبارُ أهلِ الله في .. أنفِ أمرئٍ ودخانُ نارٍ تَلهبُ

هذا كتابُ الله ينطقُ بيننا .. ليسَ الشهيدُ بميتٍ لا يكذبُ

অর্থ-

"হে হারামাইনের আকণ্ঠ নিমগ্ন সাধক! যদি তুমি আমাদের দেখতে, তবে বুঝতে যে ইবাদতের ব্যাপারে এখনও শৈশবের ক্রীড়া-কৌতুকেই ডুবে আছ।

যদি কারও গলদেশ চোখের অশ্রুতে সিক্ত হয়, তখন আমাদের সিনা হয় রক্তে রঞ্জিত।

যদি কেউ কল্পনার রাজ্যে তার ভাবনার ঘোড়াকে করে ক্লান্ত, তবে আমাদের ঘোড়াগুলো হয় যুদ্ধের দিনে পরিশ্রান্ত।

তোমাদের জন্য রয়েছে আবীরের সুবাস, আর আমাদের আবির হলো, ঘোড়ার খুরের আঘাতে উত্থিত সুবাসিত ধূলিকণা।

ওয়াল্লাহি, আমাদের কাছে আমাদের নবির সত্য ও সঠিক বাণী পৌঁছেছে যে,আল্লাহর বাহিনীর পথের ধুলো ও জাহান্নামের লকলকে আগুন কখনোও

একই ব্যক্তির নাসারন্ধ্রে একত্র হবে না।

আল্লাহর কিতাব আমাদের মাঝে সত্য কথা বলে, আর আল্লাহর পথের শহীদ কখনও মৃত নয়।"

কবিতার চরণগুলো ফুযাইল ইবনু আয়ায রহ.-এর অন্তরে গিয়ে ধাক্কা মারে। তাঁর চোখ ভরে ওঠে অশ্রুতে। তিনি এটাকে মোটেও হাজ্জে না আসার অজুহাত বলে উড়িয়ে দেননি। বরং বলে ওঠেন,

"এটাই আসল ইবাদত। এটাই আসল সাহসিকতা। যেখানে ইবনুল মুবারাক কোনো ছাড় দিচ্ছেন না।"

আল ফাসাওয়ী একবার আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক রহ. এর সাথে জিহাদে গেলেন। এক বৃষ্টিমুখর শীতের রাতে ইবনুল মুবারাককে কাঁদতে দেখলেন তিনি। আল ফাসাওয়ী কান্নার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন,

"অতীত জীবনের সকল বৃষ্টি ও শীতবিহীন রাত স্মরণ করে কাঁদছি। এই দিনগুলো খুবই আরামদায়ক ছিল। সেগুলোও যদি এমন বৃষ্টিস্নাত ও শীতার্ত হতো এবং আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে থেকে এমন কষ্টকর পরিস্থিতির বিনিময়ে সওয়াব পেতে পারতাম, সেই আফসোস এখন হচ্ছে।"

সর্বগুণের আকর

ইসমাঈল ইবনু আয়্যাশ রহ. বলেন,

"আল্লাহর সৃষ্টিজগতে আমি এমন কোনো উত্তম গুণের কথা জানি না, যা আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের মধ্যে নেই। সত্যবাদিতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, সততা, বিনয়, তাকওয়া ও ইখলাস-সহ সব ধরনের উত্তম গুণাবলি বিদ্যমান ছিল তাঁর মধ্যে।"[৫৩]

তিনি আরও বলেন,

[৫৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা (৮/৩৮৪)

لقد حدثني أصحابي أنهم صحبوا ابن المبارك من مصرَ إلى مكة، فكان يُطعمهم الخَبِيص نوع من الطعام

"আমার বন্ধুদের মুখে শুনেছি একবার তারা আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের সাথে মিশর থেকে মক্কায় সফর করছিল। তিনি সবাইকে খাবিস (আটা দিয়ে তৈরী এক ধরনের মিষ্টি খাবার) দিয়ে আপ্যায়ন করিয়েছিলেন। অথচ নিজে রোযা অবস্থায় ছিলেন পুরো সফরে।"[৫৪]

একদিন ইবনুল মুবারাকের সাথীরা পরস্পরকে বললেন,

تعالَوْا نعُد خصال ابن المبارك من أبواب الخير، فقالوا: العلم، والفقه، والأدب، والنحو واللغة، والزهد، والفصاحة، والشعر، وقيام الليل، والعبادة، والحج، والغزو، والشجاعة، والفروسية، والقوة، وترك الكلام فيما لا يَعنيه، والإنصاف، وقلة الخلاف على أصحابه؛

"চলো, আজকে আমরা বন্ধু আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের চরিত্রের ভালো দিকগুলোর একটা তালিকা বানিয়ে ফেলি।" আর সেদিন তারা তালিকায় যা যা পেলেন-'ইলম, ফিকাহ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভাষাজ্ঞান, যুহদ, বাগ্মিতা, কাব্যপ্রতিভা, তাহাজ্জুদ, ইবাদতগুজারি, হাজ্জ, জিহাদ, বীরত্ব, প্রেরণা, শক্তিমত্তা, অনর্থক বিষয়ে চুপ থাকা, সততা এবং সাথীদের সাথে কখনোই মতবিরোধে না জড়ানো।"[৫৫]

একবার হারাম শরীফে অবস্থানকালে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের ব্যাপারে সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রহ.বললেন,

"গোটা প্রাচ্যের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি।"

সেখানে আরও ছিলেন ফুযাইল ইবনু আয়াজ। সুফিয়ানের কথা শুনে তিনি বললেন,

"না। শুধু প্রাচ্যে নয়। বরং পূর্বপশ্চিম মিলিয়ে তাঁর চেয়ে উত্তম কেউই নেই।"

আল আমরী বলেন,

[৫৪] তারীখে বাগদাদ লিল খতিব আল বাগদাদী (৩৮৮/১১)

[৫৫] তারীখে দামেশক লি ইবনুলি আসাকির (৩২/৪২৯)

"আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক ছিলেন খলীফা হওয়ার সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।"

ইবনু হিব্বান হাদীসের অন্যতম ব্যাখাকারক। তিনি বলেন,

"ইবনুল মুবারাকের মধ্যে যে গুণাবলি পাওয়া যায়, তা সেসময় পৃথিবীর আর কারও কাছে পাওয়া যায়নি।"

আতা ইবনু মুসলিম রহ. বলেন,

"তোমরা কি কখনও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের মতো কাউকে দেখেছ? আমি দেখিনি। দেখবও না।"

আল কাসিম বিন মুহাম্মদ বলেন,

"একবার আমরা আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের সাথে সফরে ছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, কী এমন আছে এই লোকটার মাঝে যে, সে এতটা জনপ্রিয়? সে যদি ইবাদতগুজার হয়, আমরাও তো ইবাদত করি। সে যদি সিয়াম রাখে, আমরাও রাখি! সে যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়ে থাকে, আমরাও তো তা-ই করি! সে হাজ্জ করে, আমরাও করি! তাহলে পার্থক্যটা কোথায়?

সিরিয়া-অভিমুখে যাত্রার পথে এক বাড়িতে রাত কাটালাম আমরা। হঠাৎ ঘরের পিদিমটা নিভে গেল। কেউ কেউ জেগে উঠল এতে। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক নিভে যাওয়া পিদিম হাতে বাইরে বেরিয়ে গেলেন পুনরায় জ্বালানোর জন্য। কিছুক্ষণ বাইরে অবস্থান করে ইবনুল মুবারাক পিদিম হাতে আবার ঘরে ঢুকলেন। পিদিমের আলোয় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল ইবনুল মুবারাকের চেহারার দিকে। দেখলাম চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে আছে। তখনই আমি মনে মনে বললাম, এই সেই আল্লাহর ভয়, যা আমাদের সবার কাছ থেকে ইবনুল মুবারাকের মর্যাদাকে আলাদা করে দিয়েছে। লোকচক্ষুর আড়ালে যাওয়ার সুযোগ পেয়েই তিনি আখিরাতের কথা ভেবে অঝোরে কেঁদে নিয়েছেন।"[৫৬]

[৫৬] ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়াহ

আধ্যাত্মিকতা

শয়তান অনেক সময় মানুষের মনে খুঁতখুঁতে ভাব তৈরি করে। তার জন্য নেক আমল কষ্টকর করে তোলে। একই কাজ বারবার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায় মানুষ। এই ওয়াসওয়াসা দূর করতে পারাও এক ধরনের ক্ষমতা।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক একদিন গোসল করছিলেন। শয়তান তাঁকে এই বলে ওয়াসওয়াসা দিলো যে, তোমার তো শরীরের এই অংশটা পরিষ্কারই হয়নি। ইবনুল মুবারাক জবাব দিলেন, "আমি পরিষ্কার করেছি।" শয়তান বলল, "না, করোনি।" এবার ইবনুল মুবারাক জবাব দিলেন, "তুমি যেহেতু প্রথমে এই দাবি তুলেছ তা হলে তুমিই তোমার দাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করো।" তবু তিনি স্রেফ শয়তানের প্ররোচনার বশে একই কাজ অতিরিক্ত করেননি।

আল হাসান ইসা বিন সিরজিস নামে এক খ্রিষ্টান ব্যক্তির সাথে ইবনুল মুবারাকের পরিচয় ছিল। তাঁর ধর্মীয় পরিচয় জানার সাথে সাথে ইবনুল মুবারাক দুআ করলেন, "হে আল্লাহ, তাকে মুসলিম হিসেবে কবুল করুন।" ইবনুল মুবারাকের এই দুআর সত্যিই প্রভাব পড়ে। আল হাসান বিন ইসা ইসলাম গ্রহণ তো করেনই, সেইসাথে পরিণত হন অসাধারণ এক মুসলিমে। এরপর জ্ঞান অন্বেষণে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করেছেন তিনি। একসময় পরিচিতি লাভ করেন উম্মাহর এক বিজ্ঞ আলেম হিসেবে।

দুআ কীভাবে সর্বাধিক কার্যকর করতে হয়, সেই জ্ঞান ইবনুল মুবারাকের ছিল। যমযমের পানি পানকালে যে দুআ করা হয়, তা কবুল হয়। প্রায় সময় মানুষ পার্থিব কোনো প্রাপ্তির দুআ করে এই সময়। কিন্তু ইবনুল মুবারাক যমযমের পানি পানের সময় দুআ করতেন যেন তাঁর দ্বীনি জীবন সুন্দর হয়ে যায়।

সাধারণ মানুষের মাঝে জনপ্রিয়তা

হাম্মাদ বিন ইয়াযীদের সাথে তখনও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের সামনাসামনি পরিচয় হয়নি। এ অবস্থায় কথোপকথনে ইবনুল মোবারকের কাছে হাম্মাদ জানতে

চান,

: আপনার বাড়ি কোথায়?

: আমি খোরাসানি।

: খোরাসানের কোথায়?

: খোরাসানের মার্ভ এলাকার।

: আপনি কি সেখানকার বিদগ্ধ আলিম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাককে চেনেন?

: হ্যাঁ। চিনি।

: তাঁর ব্যাপারে আমাকে একটু বলুন তো! তিনি কী করেন? কোথায় যান? তাঁর কাছে কী কী আছে? কেমন মানুষ তিনি?

তখন ইবনুল মোবারক বলেন

: আমিই সেই ব্যক্তি।

একজন বিদগ্ধ ফক্বীহ, বড় ব্যবসায়ী ও অভিজ্ঞ মুজাহিদ হয়েও তাঁর সাদাসিধে চালচলনে তা বোঝার জো নেই। কিন্তু যারা তাঁকে একবার চিনতে পারে, তাদের কাছে মাথার মুকুট হয়ে থাকেন তিনি।

সেসময় খলীফা হারুনুর রশীদ ছিলেন মুসলিম জাহানের খলীফা। একদিন খলীফার দাসী প্রাসাদ থেকে দেখতে পেলেন যে, এক লোকের চারপাশে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে আছে। তিনি তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তাঁকে বলা হলো এই ব্যক্তিটি হচ্ছেন খোরাসানের বিজ্ঞ ও নেতৃস্থানীয় আলিম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক। তিনি বললেন,

> **"এই লোকই হচ্ছেন সত্যিকারের বাদশাহ। হারুন তো দেহরক্ষী ছাড়া বের হতেই পারে না। আর এই ব্যক্তিটির হাজারো লোকের বেষ্টনীর মধ্যেও কোনো পুলিশ ও বাহিনীর প্রয়োজন পড়ছে না। এটাই আসল বাদশাহী।"[৫৭]**

[৫৭] তারীখে বাগদাদ

বদান্যতা

ইবনুল মুবারাক কেবল একজন বিদগ্ধ আলিম এবং দক্ষ মুজাহিদই ছিলেন না। পাশাপাশি ছিলেন ধনী ব্যবসায়ীও। ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর মতো আত্মনির্ভরশীল ছিলেন তিনিও। ব্যবসা করতেন, যেন নিজেই নিজের ব্যয়ভার বহন করতে পারেন। যেন ইলম অন্বেষণ করতে গিয়ে হাত না পাততে হয় কারও কাছে।

জন্মভূমি খোরাসানের মার্ভ শহরে তাঁর বাড়ির বারান্দাটিই ছিল ৫০ গজ লম্বা, ২৫ গজ চওড়া। বারান্দার গোটা আঙিনা প্রয়োজনগ্রস্তদের পদচারনায় মুখর থাকত। কেউ মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসত, কেউ ইলম অর্জনের জন্য, কেউ আসত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। পরে বাগদাদে বসবাসকালে সেখানে ছোট একটি ঘর কিনে অপরিচিত জীবনযাপন করতে থাকেন তিনি।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহিমাহুল্লাহ) গোটা শহরের সকল অধিবাসীকে নিজের খরচে হাজ্জে নিয়ে যেতেন। একবার এরকম এক ঘোষণা দিলেন কিন্তু খরচের কথাটি বললেন না। হাজ্জ গমনেচ্ছুরা সবাই নিজ নিজ খরচের টাকার থলি জমা দিয়ে দিল তাঁর কাছে। সবার থলি একটি সিন্দুকে রেখে হাজ্জে রওয়ানা হয়ে গেলেন তিনি। নিজেই বহন করলেন সকল যাত্রাসঙ্গীর পরিবহন ও খাবারের খরচ। এমনকি হাজ্জ শেষে মদীনায় অবস্থানকালে সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন,

“ভাইয়েরা! বাসার জন্য কিছু নিয়ে যাবেন?” যে যা নেওয়ার কথা বলল, প্রত্যেককে বাজারে নিয়ে গিয়ে ওই জিনিসপত্র কিনে দিলেন তিনি। মক্কা শরীফে গিয়ে সেখানেও সবাইকে বললেন, “মক্কা থেকে বাসার জন্য কিছু নিয়ে যাবেন?” আবারও কিনে দিলেন যার যার প্রয়োজনীয় জিনিস।

তারপর সফর শেষে শহরে ফিরে এলেন। সেখানে পৌঁছে আলিশান আপ্যায়ন করালেন সবাইকে। সাথে পেশ করলেন অনেক উপহারও। তারপর ওই সিন্দুক খুললেন, যাতে যাবার সময় প্রত্যেকের টাকা পয়সার থলে রাখা ছিল। প্রত্যেককে যার যার থলে ফেরত দিলেন। বদান্যতার সমুদ্র বইয়ে দিলেন তিনি এভাবে।[৫৮]

আরেকবার তিনি হাজ্জে যাচ্ছেন। এক কাফেলাও ছিল সঙ্গে। পথিমধ্যে একস্থানে কাফেলার লোকদের একটি মুরগি মারা যায়। মুরগিটি আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেয়

[৫৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা

তারা। ইবনুল মুবারাক ছিলেন কাফেলা থেকে সামান্য পেছনে। দেখলেন যে, পাশের বসতি থেকে একটি মেয়ে ক্ষীপ্র বেগে বেরিয়ে এলো। মুরগিটি উঠিয়ে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে গেল সেখান থেকে। ইবনুল মুবারাক অত্যন্ত বিচলিত হলেন এটা দেখে। বেরিয়ে পড়লেন অনুসন্ধানে। অনেক তালাশের পর খুঁজে পেলেন মেয়েটির বাড়ি। তাকে মৃত মুরগি নিয়ে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর মেয়েটি আসল কথা জানাল। তার বাবা মারা গেছেন, ছিলেন ঘরের একমাত্র উপার্জনকারী। মা আর সে শুধু থাকে এখন। ঘরে খাবার কিছুই নেই। অনাহারে এমন অবস্থা হয়েছে যে, আর হালাল-হারাম বাছার জো নেই। মৃত প্রাণীই সংগ্রহ করে খেতে হচ্ছে।

একথা শুনে হাজ্জরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের অন্তরে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। তিনি চিন্তা করলেন, সেও তো আল্লাহ বান্দা। অথচ অবস্থার কত তফাৎ! তাঁর কাছে তখন ছিল দুই হাজার দিনার। বাড়ি ফেরার জন্য বিশ দিনার রেখে বাকিটা ওই মেয়েকে দিয়ে দেন তিনি। সে বছর আর হাজ্জে যাননি।[৫৯]

আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনু ঈসা (রহিমাহুল্লাহ),

قال محمد بن عيسى: ، وكان ينزل الرَّقَّة في خانٍ، فكان شاب يختلف إليه، ويقوم بحوائجه، ويسمع منه الحديث، فقدم عبدالله مرةً، فلم يرَه، فخرج في النفير (أي الجهاد في سبيل الله) مستعجلًا، فلما رجع، سأل عن الشاب، فقال: محبوس على عشرة آلاف درهم،فاستدل على الغريم (صاحب الدَّين)، ووزن له عشرة آلاف، وحلفه ألا يخبر أحدًا ما عاش، فأخرج الرجل، وسرى ابن المبارك، فلحقه الفتى على مرحلتين من الرَّقَّة، فقال لي: يا فتى، أين كنت؟ لم أرَك! قال: يا أبا عبدالرحمن، كنت محبوسًا بدَين،قال: وكيف خلصت؟ قال: جاء رجل فقضى دَيني، ولم أدرِ،قال: فاحمَدِ الله، ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبدالله بن المبارك

ইবনুল মুবারাক যখনই রাক্কা শহরে যেতেন, এক যুবক এসে সাক্ষাৎ করত। হাদীস শুনত তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু একবার রাক্কায় গিয়ে আর ওই ছেলের সাক্ষাৎ পেলেন না। লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন তার খবর কী। জানা গেল যে, তার দশ হাজার দিনার ঋণ জমে গেছে। ঋণদাতা তাকে গ্রেফতার করে

[৫৯] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

জেলখানায় দিয়েছে। ইবনুল মুবারাক ঋণদাতার ঠিকানা জেনে তার ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন। বললেন, "আমার এক বন্ধু আছে। আপনার কাছে ঋণের দায়ে কারাগারে আছে এখন। আমি এ ঋণ পরিশোধ করে দিচ্ছি; কিন্তু একটা শর্ত। আমার জীবদ্দশায় তাকে বলবেন না যে, কে এই ঋণ পরিশোধ করেছে। কসম করে বলুন।" ঋণদাতা প্রতিজ্ঞা করল।

যুবকটি কারামুক্ত হয়ে জানতে পারল যে, কয়েকদিন আগেই ইবনুল মুবারাক রাক্কা থেকে বের হয়েছেন। ফলে যুবকটি রওনা দিয়ে তাঁকে ধরে ফেলল। ইবনুল মুবারাক বললেন, "শুনলাম তুমি নাকি জেলখানায়?"

সে উত্তর দিলো, "জি, জেলেই ছিলাম। এখন আল্লাহ তাআলা মুক্তি দান করেছেন।"

"কীভাবে বের হলে?"

"আল্লাহ তাআলা গায়েবি ফেরেশতা পাঠিয়েছেন। সে-ই আমার ঋণ পরিশোধ করে দিলো।"

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের রহিমাহুল্লাহ'র ইন্তিকাল পর্যন্ত যুবকটি জানতেই পারেনি যে, কে আসল ঋণ পরিশোধকারী।[৬০]

ইবনুল মুবারাক ছিলেন অভিজাত বংশের ছেলে এবং সর্দার শ্রেণির ব্যক্তিত্ব। তাই দ্বীনে প্রত্যাবর্তনের পরও একেক সময় তার দস্তরখানে দশ-পনেরো পদের খাবার থাকত। বিরাট আসর জমত খাবারের। কিন্তু তিনি নিজে রোজা রাখতেন। মানুষকে ডেকে ডেকে খাবারের দাওয়াত দিতেন এবং প্রয়োজন পূরণ করতেন তাদের।

ইবনু আল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

> **"আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহিমাহুল্লাহ) গরিব অভাবীদের জন্য বছরে ১ লক্ষ দিরহাম দান করতেন।"**

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক জানতেন যে, দ্বীনের জন্য জিহাদ ও ত্যাগ সর্বপ্রথম অর্থ দিয়েই শুরু করতে হয়। তাঁর কাছে এত সম্পদ ছিল, কিন্তু সেসবের প্রতি কোনো আসক্তি ছিল না তাঁর। তাই মানুষের জন্য খরচ করতেন দুহাতে। হিসাব রাখতেন না কাকে কী দান করেছেন। কাউকে কোনো বই দিলে সেটা ফেরত নিতেন না। কাউকে

[৬০] তারীখে বাগদাদ লিল খতিব বাগদাদি (৩৮৮/১১)

এক সপ্তাহের জন্য টাকাপয়সা ধার দিলে সপ্তাহ মাস বছর পেরিয়ে যেত, কিন্তু নিজ থেকে চাইতেন না সে টাকা।

কিন্তু দেনা মেটানোর ব্যাপারে ছিলেন একেবারে তৎপর। একবার তিনি তাঁর এক

সিরীয় বন্ধুর কাছ থেকে একটি কলম ধার নিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা পরে ফেরত দিতে ভুলে যান। ইরাক পর্যন্ত চলে আসার পর মনে পড়ে কলমটির কথা। তিনি পুনরায় ইরাক থেকে শামে সফর করেন শুধুমাত্র এই কলমটি ফেরত দেওয়ার জন্যই।

ইন্তিকাল

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহিমাহুল্লাহ)-এর জীবনের মতো মৃত্যুটাও ছিল বর্ণাঢ্য। হিজরি ১৮১ সনে (৮০৩ খ্রিস্টাব্দ) তেষট্টি বছর বয়সে জিহাদ থেকে গাজীবেশে ফিরে আসার পর ইন্তিকাল করেন তিনি। এই বয়সেও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। তাই সরাসরি ময়দানে শহীদ না হলেও তাঁর এই মৃত্যু শাহাদাতেরই সমতুল্য। ইরাকের হাইতে ফোরাত নদীর তীরে দাফন করা হয় তাঁকে। এখনও তাঁর মাজারে মানুষ যিয়ারত করতে যায়।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক রহ. শুধুমাত্র একজন ইলমের শাইখ ছিলেন না। তিনি ছিলেন আমলেরও শাইখ। শুধু আলিম এবং ফক্বীহ ছিলেন না। বরং ছিলেন একজন আমলদার দাঈ। তিনি কুরআন-হাদীস-ফিক্বহের আলিম হয়ে মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁর দাওয়াত মানুষ কবুল করেছে। কারণ অন্তর থেকে নির্গত কথা অন্তরেই দাগ কাটে। কিন্তু মুখের কথা থেমে যায় কান অবধি। তিনি অন্তর দিয়ে কথা বলতেন।

ইবনুল মুবারাকের ওপর আল্লাহ তাআলা রহম করুন। আমাদেরকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফীক দান করুন।

তথ্যসূত্র-
আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া -ইবনু কাসীর
সিয়ারু আলামিন নুবালা- ইমাম আয-যাহাবী
তাকাদ্দুমাত আল-জারহ ওয়া আল-তাদীল-ইবনু আবী হাতিম আর-রাযি
তাযকিরাতুল হুফফাজ
তারতিব আল মাদারিক (১/ ১৫৯)
সিফাত আস সাফওয়াহ (২/৩২৭)

যুগের ত্রাতা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷫

উম্মাহর কঠিন দুর্দিনে কিছু দরদি মানুষ হয়তো আল্লাহর কাছে দুআ করছিলেন, "হে আল্লাহ, আমাদের কাছে এমন কাউকে পাঠিয়ে দিন, যিনি আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করে দেবেন। উম্মাহকে দুর্দশা থেকে মুক্ত করবেন।" আল্লাহ তাআলা যেন সেসকল মানুষের বিনয়াবনত দুআয় সাড়া দিয়ে প্রেরণ করেন এক মহান মনীষীকে। এমন এক ব্যক্তিকে, যিনি সে যুগের জন্য বহুল প্রতীক্ষিত।

তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাকে ইতিহাস আমাদের কাছে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের (রহিমাহুল্লাহ) মতো হাদীসের ইমাম হিসেবে পরিচয় করায়নি। অথবা ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের মতো মর্দে মুজাহিদ হিসেবেও না। তবুও তিনি এসব মর্যাদা ও উপাধিকে ছাড়িয়ে বহুদূর চলে গেছেন। ইতিহাস তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে শাইখুল ইসলাম হিসেবে। শাইখুল ইসলাম তক্বিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আব্দুল হালিম ইবনু মাজদুদ্দীন আব্দুস সালাম ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবুল কাসিম আল খিদর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আল খিদর ইবনু আলি ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু তাইমিয়্যা আন নুমায়রি আল হাররানি আদ দামেশকী। সংক্ষেপে আমরা এই মহান ইমামকে চিনি 'ইবনু তাইমিয়্যা' নামে। কিন্তু তাঁর জন্মের সময়টাতে মুসলিম উম্মাহ ছিল একাধিক দিক দিয়ে টালমাটাল।

ধর্মীয় ভ্রান্তির সয়লাব

মুসলিম উম্মাহ যখন যে সমস্যায় পড়েছে, ঠিক তখনই আল্লাহ তাআলা সে সংকটের উপযুক্ত সমাধানকারী কোনো ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন। এটি একেবারে পরীক্ষিত বাস্তবতা। অতীতেও সব যুগে এমন হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে।

ইবনু তাইমিয়্যার যুগে মুসলিম বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক উভয় প্রকার আগ্রাসনে পিষ্ট হচ্ছিল। সমাধি রচিত হয়েছিল নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার। অনেকটা বর্তমানের মতোই দার্শনিকদের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামকে আক্রমণ করা হতো। আজ যেভাবে বিজ্ঞানবাদ ও সেক্যুলারিজমের ধাঁধায় পড়ে অনেকে পথ হারাচ্ছে, সে যুগে একই রকম ফাঁদ পেতেছিল গ্রিক যুক্তিবিদ্যা ও দার্শনিক ধ্যানধারণা। ইসলামের পক্ষে লড়ে চলা অনেকেই আটকে গিয়েছিলেন সেসব ফাঁদে।

যে সময়কার কথা বলা হচ্ছে, ততদিনে মুসলিমরা খ্রিষ্টানদের বহু ভূখণ্ড জয় করে নিয়েছে। যুদ্ধের রেশ কেটে যাওয়ার পর উভয় জাতির মাঝে স্থাপিত হয়েছে আন্তঃযোগাযোগ। বহু খ্রিষ্টান নিজেদের অঞ্চল থেকে ইসলামী ভূমিতে এসে বসতি স্থাপন করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল তাদের কিতাবের আলিম, কেউ আবার আরবি শিখে পড়া শুরু করে কুরআন ও হাদীস। তারাই একসময় মুসলিমদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কুতর্ক শুরু করে। নবুওয়াতের সমাপ্তি, কুরআনের অবিকৃতি, সুন্নাহর প্রামাণ্যতা-সহ নানান বিষয়ে সন্দেহ ছড়িয়ে দিতে থাকে মুসলিম সমাজে।

আজকের যুগেও প্রাচ্যবিদরা আমাদের অনেকের চেয়ে ভালো করে আরবি শিখছে। নিবিড়ভাবে কুরআন ও হাদীসের ওপর চালাচ্ছে উচ্চস্তরের গবেষণা। কুরআন ও সুন্নাহকে বিকৃত প্রমাণ করার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। যেহেতু তাদের ধর্ম বিকৃত হয়ে গেছে, তাই তারা চায় ইসলামের বুনিয়াদি গ্রন্থটিও বিকৃত প্রমাণিত হয়ে যাক।

সেইসাথে মুসলিমরাও তখন খ্রিষ্টানদের অনুকরণে সাধু-সন্ন্যাসীদের উপাসনা শুরু করে দেয়। উদযাপন করতে শুরু করে খ্রিষ্টানদের উৎসবগুলোও।

'বাতেনি' নামে পরিচিত আরও একটি দল ছিল ইবনু তাইমিয়্যার যুগে। তারা দাবি করত যে, কুরআনের রহস্য সম্বন্ধে তাদেরকে বিশেষ জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। যেমন, সাধারণ মুসলিমদের কাছে 'সালাত' শব্দের অর্থ আমরা যা জানি, তা-ই। কিন্তু

বাতেনিরা সালাতের মনগড়া ব্যাখ্যা হাজির করে অন্য সবার মতো সালাত পড়তে অস্বীকৃতি জানায়। এ রকম অনেক জায়গায় কুরআনকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করতে থাকে তারা। শিয়াদের ধ্যানধারণার অনেক প্রভাবও ছিল তাদের ওপর।

আরও ছিল কিছু ভ্রান্ত সুফি। সালাফদের দেখানো সত্যিকার তাসাউফ বাদ দিয়ে তারা মনগড়া এক সুফিবাদের প্রচার শুরু করে। এতে মিশ্রিত ছিল হিন্দুয়ানি সর্বেশ্বরবাদী সংস্কৃতি ও অজ্ঞেয়বাদী ধ্যানধারণার প্রলেপ। অনেকে তো জাদুবিদ্যাতে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে শুরু করে।

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা

বাগদাদকে তাতাররা মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার পাঁচ বছর পরেই ইবনু তাইমিয়্যাহর (রহিমাহুল্লাহ) জন্ম। অবশ্য তাঁর জন্মের তিন বছর আগে সুলতান মুযাফফর কুতযের (রহিমাহুল্লাহ) হাতে তাতাররা আইনে জালুতের প্রান্তরে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। সিরিয়া ও ফিলস্তিনকেও তাতারদের হাত থেকে মুক্ত করে পুনরায় ইসলামী ভূখণ্ডে পরিণত করা হয়। তারপরেও খোরাসান, সিন্ধু প্রদেশ, ইরান ও ইরাক তখনও ছিল তাতারদের দখলে। তাই সব সময়ই তাদের দিক থেকে মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণের আশংকা থাকত।

সেসময়ে খলীফা ছিলেন একজন মামলুক সুলতান, নাম দাহির বাইবার্স। সুলতান মুযাফফর কুতযের মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তিনি। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! কোনো মামলুক সুলতানই বেশিদিন সিংহাসনে থাকতে পারতেন না। খুব দ্রুত নিজেদের শাসক পরিবর্তন করে ফেলত মামলুকরা। অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসত। এক সুলতান স্থির হতে না হতেই এসে যেত অন্য আরেকজন।

কিন্তু ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার জীবদ্দশায় যিনি সুলতান ছিলেন, তিনি ৭০৯ হিজরি থেকে প্রায় ৩৩ বছরকাল শাসন করেন। তার নাম সুলতান আন নাসির আদ দ্বীন মুহাম্মাদ বিন কালউন।

তাতারদের অনেকেই মুসলিমদের সামাজিক অবস্থা ও নৈতিক পরিশুদ্ধতা প্রত্যক্ষ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নেয়। হিংস্র মঙ্গোলদের মধ্যেও বয়ে যায় ইসলামের সুশীতল বাতাস। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে ছিল স্রেফ নামকাওয়াস্তে মুসলিম।

শরীয়তের কঠোর বিধিনিষেধের অধীনে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে প্রস্তুত ছিল না তারা। অনেকেই লিপ্ত ছিল ধূমপান, মদ্যপান এবং যিনায়। সবচেয়ে বড় কথা, তারা বিচারকার্য পরিচালনা করত চেঙ্গিস খানের করা মঙ্গোলীয় আইন দিয়ে; শরিয়াহ দিয়ে নয়। সুতরাং বলা যায়, তারা ঈমান এনেছিল ঠিক, কিন্তু এই ঈমান তারা আত্মস্থ করেনি; এই ঈমান তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়নি। তারা এমন এক ইসলাম চাইত, যা হবে তাদের মনমতো।

যুগের চাহিদাপূরণকারী

এই সময় এমন কাউকে প্রয়োজন ছিল, যিনি এই প্রতিটি ভ্রান্তির জঞ্জাল ছিঁড়ে ফেলবেন একাই। যেখানে যা বন্ধ করা প্রয়োজন, তা বন্ধ করে দেবেন। এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, যা ইসলামকে সকল অঞ্চলে পুনরায় জীবন্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আগের ধারায়।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার (রহিমাহুল্লাহ) মধ্যে ছিল ঠিক এই জিনিসটিই। সেই উদ্দীপনা, সেই জোশ, সেই নবজীবনের সূচনা, যা তাঁর চরিত্র, গুণাবলি, লেখনী, কর্মদক্ষতা ও পদক্ষেপের প্রতিটি পদে পদে দৃশ্যমান।

৬৬১ হিজরিতে (১২৬৩ খ্রিস্টাব্দ) রবিউল আওয়াল মাসের ১০ তারিখ পৃথিবীর বুকে আসেন এই যুগান্তকারী ব্যক্তি। জন্মস্থান হাররান প্রদেশ। হাররান ওই সময়ে উত্তর ইরাকের অংশ ছিল, বর্তমানে তা তুরস্কে। তাঁর পিতা আব্দুল হালিম ছিলেন সিরিয়ার দামেশকে অবস্থিত গ্র্যান্ড উমাওয়ী মাসজিদের ইমাম। আর পিতামহ আবুল বারাকাত মাজদুদ্দীন ছিলেন প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ হাদীসের সম্ভার 'মুন্তাকিল আখবার' গ্রন্থের রচয়িতা। ইমাম আশ শাওকানীর (রহিমাহুল্লাহ) 'নায়লুল আওতার' গ্রন্থটি এই গ্রন্থেরই ব্যাখ্যা। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার পরিবার কী পরিমাণ সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত।

দুঃসহ শৈশবস্মৃতি

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) সাতবছর বয়সেই এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন, যা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তাঁকে শাইখুল ইসলামে পরিণত হতে সহায়তা করে। তিনি দেখেছেন, তাতাররা তাঁর শহর ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাতারদের ভয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করছে মানুষ। আপন ভূমি ছেড়ে পালিয়ে চলে যাচ্ছে মিশর-সহ বিভিন্ন ভূখণ্ডে। তাঁকেও সপরিবারে পালাতে হয়েছে দামেশকে।

তাঁর পিতাকে তাঁর সমস্ত বইপত্র বহন করে নিয়ে যেতে হয়েছিল সেসময়। বইয়ের বোঝা এত ভারী হয়ে গিয়েছিল যে, একটা সময় হঠাৎ তা মাটিতে আটকে যায়। এদিকে পেছন থেকে ধেয়ে আসছে শত্রুবাহিনী। ইবনু তাইমিয়্যার পরিবারের সকলে আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে সোপর্দ করে তাঁকে স্মরণ করতে থাকে। অবশেষে তাদেরকে হেফাজত করেন আল্লাহ তাআলা। কাফেলা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

ছোটবেলা থেকেই গ্রামবাসীকে অত্যাচার-নিগ্রহের মাঝে বাস করতে দেখে ইবনু তাইমিয়্যার মাঝে গড়ে ওঠে ভবিষ্যতের মুক্তির অদম্য স্পৃহা। অত্যাচারের মাত্রা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, যত তাদেরকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে, ততই পূর্ণতা লাভ করেছেন ভবিষ্যতের শাইখুল ইসলাম। একপর্যায়ে তিনিই আবির্ভূত হয়েছেন যুগের ত্রাতা হিসেবে।

বর্তমানে আমাদের তরুণ প্রজন্ম টেলিভিশনের পর্দায় বা স্বচক্ষে ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, ফিলিস্তিনে বোমা পড়তে দেখে। আরও দেখে মাসজিদ, মাদরাসা ও ভবন ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে। এই অত্যাচার-নিগ্রহের অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে এমনই স্পৃহার জন্ম দিবে। ভবিষ্যতে তাদের মধ্য থেকেই ইনশাআল্লাহ বেরিয়ে আসবেন এ যুগের ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা। নেতৃত্ব দেবেন ইসলামের নবজাগরণের।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা তাতারদের ভয়াল রূপ দেখেছেন নিজের চোখের সামনে। আবার জেনেছেন আইনে জালুতের প্রান্তরে সেই তাতারদেরই শোচনীয় পরাজয়ের ইতিহাস। তিনি উপলব্ধি করেন যে, মুসলিমরা নিজেদের দ্বীনকে ধারণ করে উঠে দাঁড়ালে কোনো শক্তিই তাদের সামনে অপরাজেয় নয়। আইনে জালুতকে স্বচক্ষে না দেখেও তাঁর অন্তরে ছিল সেই বিজয়ের চেতনা ও স্পৃহা।

গ্রন্থগত মেধা

সাহস, চেতনা ও অদম্য স্পৃহার পাশাপাশি ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার (রহিমাহুল্লাহ) ছিল পুঁথিগত বিদ্যা ও অশেষ পাণ্ডিত্য। শৈশবকাল থেকেই ছিল প্রখর মেধাশক্তি।

সপরিবারে হাররান থেকে দামেশকে চলে আসার আগে ইবনু তাইমিয়্যার বাবা ছিলেন গ্র্যান্ড উমাওয়ি মাসজিদের ইমাম ও মুহাদ্দিস। তাই দামেশকবাসী চাইল যে, তিনি এখানেও মাসজিদের ইমাম হবেন। কিন্তু হঠাৎ করে লোকমুখে শোনা যেতে লাগল যে, ইবনু তাইমিয়্যা নামক এক অসামান্য প্রতিভাধর বালক আছে। তা শুনে একজন আলিম দামেশক এলেন শুধুমাত্র ওই বালকের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে। তাদের বাড়ির কাছাকাছি এসে এক দর্জির কাছে জানতে চাইলেন, "ইবনু তাইমিয়্যা নামের ছেলেটা কোথায় থাকে?" দর্জি বলল, "একটু পরেই এসে যাবে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন।" অপেক্ষা করতে লাগলেন ওই আলিম। একটু পর ইবনু তাইমিয়্যা হাতে করে বই ও শ্লেট নিয়ে আসলেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। কোনো ইসলামী ইলমি মজলিসে যাওয়ার সময় বই এবং খাতা-কলম নিয়ে আসা উচিত। স্কুল-কলেজে যাওয়ার সময় যেমনটা করি, ঠিক সেভাবে।

আলিম তাকে বললেন, "তোমার শ্লেটের সব লেখা মুছে আমাকে দাও।" ইবনু তাইমিয়্যা তা-ই করলেন। আলিম শ্লেটটি হাতে নিয়ে তাতে ১৩টি হাদীস লিখলেন। এরপর ইবনু তাইমিয়্যাকে বললেন একনজরে সবকটি হাদীস দেখে নিতে। দেখার পর আবারও শ্লেটটি ফেরত নিয়ে নিলেন আলিম। বললেন, "এবার সবগুলো মুখস্থ শোনাও তো।" ইবনু তাইমিয়্যা গড়গড় করে বলে দিলেন সবগুলো। একটুও ভুল করলেন না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ওই হাদীসগুলোর সনদ, বর্ণনার ধারাবাহিকতা ও রাবীদের নাম লিখে একইভাবে পরীক্ষা নিলেন তিনি। এবারও ইবনু তাইমিয়্যা সব তথ্য বলে দিলেন। অথচ তিনি তখন সবে মাত্র বালক। তাঁর এহেন প্রতিভা দেখে সেই আলিম বললেন, "ইনশাআল্লাহ এই বালক একদিন অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবে। অদ্বিতীয় একজন ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে পৃথিবীর বুকে।"

ইবনু তাইমিয়্যা ছিলেন জ্ঞানার্জনের পথে নিবেদিতপ্রাণ। ব্যাকরণশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব,

ক্যালিগ্রাফি, গণিত, শরীয়াহ, ফিক্বহ এবং হাদীসে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন তিনি। হাদীস, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা শাস্ত্রে তাঁর দুইশ'র অধিক শিক্ষক ছিল।

বিতর্কশাস্ত্রে মুনশিয়ানা

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। সেসময় হাম্বলী মাযহাবের স্বপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন করার মতো সাহস কারোরই ছিল না। কারণ সকলেই বুঁদ হয়ে ছিল যুক্তি ও দর্শনে। হাম্বলী মাযহাবের উসুল নিয়ে কেউই মাথা ঘামাত না। ইবনু তাইমিয়্যাও যুক্তি ও দর্শনে পাণ্ডিত্য অর্জনের প্রতিজ্ঞা করেন। উদ্দেশ্য, এর মাধ্যমে হাম্বলী মাযহাবের পক্ষে কঠিন ও অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন।

ইসলামকে আক্রমণে শত্রুরা যেসকল যুক্তির উপাদান ও কলাকৌশল ব্যবহার করত, তিনিও সেগুলো শিখে নেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হতো গ্রীক দর্শন। এছাড়া খ্রিস্টবাদের তাবৎ জ্ঞান, যুক্তি, দর্শনও শিখে নিয়েছিলেন তিনি। এসব বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ছিল দেখার মতো।

তাফসীর পারদর্শিতা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) কুরআনুল কারীমের তাফসীরে কী রকম দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তাঁর মুখেই শোনা যাক,

ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير، ثم أسأل الله الفهم، وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها، وأمرّغ وجهي في التراب، وأسأل الله تعالى، وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني"

"আমি কুরআনের কেবলমাত্র একটি আয়াতের অন্তত ১০০টি ব্যাখ্যা পড়ি। তারপর আবার আল্লাহর কাছে দুআও করি, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে এই আয়াতের সত্যিকার অর্থের জ্ঞান দান করুন।"

তিনি আরও দুআ করতেন, "হে আল্লাহ, হে ইবরাহীম ও আদম আলাইহিমাস সালামের শিক্ষক, আমাকে এই আয়াতসমূহের অর্থ শিক্ষা দিন, নিগূঢ় তত্ত্ব

দান করুন।”[৬১]

ইবনু তাইমিয়্যা বলতেন,

“আমি প্রায়ই কোনো পরিত্যক্ত মাসজিদ কিংবা জনমানবহীন স্থানে গিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করতাম। কপাল ঠেকিয়ে রাখতাম মাটিতে। আর আল্লাহকে বলতাম, ‘হে আল্লাহ, আমাকে এই আয়াতসমূহের অর্থ শিক্ষা দিন।’”

শত্রুদের কাছে স্বীকৃতি

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার (রহিমাহুল্লাহ) শত্রু ও চরম প্রতিদ্বন্দ্বীরাও তাঁর মেধা ও যোগ্যতাকে স্বীকার করতেন। বাধ্য হতেন স্বীকার করতে। এমনই এক কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী কামালুদ্দীন আয জামালখানী বলেছেন,

“মন দিয়ে শুনে রাখো। আল্লাহ তাআলা সকল শাস্ত্রের জ্ঞান ইবনু তাইমিয়্যার জন্য এমন সহজ করে দিয়েছেন, যেভাবে তিনি দাউদের (আলাইহিস সালাম) জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার প্রশ্নোত্তর শুনে শ্রোতাদের মনে হয় যে, শুধুমাত্র এ বিষয়ের বিদ্যা শিখতেই তাদের এক জীবনের পুরোটা লেগে যাবে। অথচ তিনি একই সাথে এ রকম বহুবিদ্যায় পারদর্শী। তাঁর আরেকটি বিশেষত্ব ছিল যে, বিভিন্ন মাযহাবের আলিমগণ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তার দারসে বসতেন। ইবনু তাইমিয়্যার মুখে নিজেদের মূলনীতিমালা ও মতগুলোর ব্যাখ্যা শুনতেন একেবারে ভিন্ন আঙ্গিকে। খুঁজে পেতেন চিন্তার এক নতুন দুয়ার।”

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা তাঁর সমগ্র জীবনে যা কিছু মত দিয়েছেন, যত দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন, তার সবগুলোরই সমালোচনা করা হয়েছে। কোনোটিই বিনা বাধায় গৃহীত হয়নি, হোক সেই মতামত ধর্মীয় বা জাগতিক বিষয়ে। দ্বিমতকারী থাকতই। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য স্বীকার করতে কেউই দ্বিধাবোধ করত না।

[৬১] আল উকুদ আদ দুর্‌রিয়্যাহ (৪২/১)

শিক্ষক হিসেবে অভিষেক

মাত্র ২২ বছর বয়সেই পিতার ইন্তিকালের পর গ্র্যান্ড উমাওয়ী মাসজিদে হাদীসের দারস দিতে শুরু করেন ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ)। একই বছরে নিয়োগ পান দামেশকের প্রধান মুফতি হিসেবে। জীবনের প্রথম বক্তৃতাটিই ছিল বহু বিদগ্ধ আলিমের সামনে। এক শ্বাসরুদ্ধকর বক্তব্য ছিল তা। মুখ দিয়ে শব্দের বদলে যেন আগুন বের হচ্ছিল।

প্রখ্যাত মুফাসসির ও ইতিহাসবিদ ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাঁর সেই বক্তব্য ছিল চিত্তাকর্ষক, জ্বালাময়ী এবং ভাবগাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ।[৬২] ৬৮৩ হিজরি বর্ষের সেই বক্তৃতাটি ছিল পুরো বছরের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাগুলোর একটি। ইতিহাসবিদ ও প্রখ্যাত লেখকদের লেখায় ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে এই বক্তব্য। ইবনু কাসীর থেকে শুরু করে শাইখ তাজউদ্দীন আল ফাযযাদী বক্তৃতাটি হুবহু লিখে রেখেছিলেন। এরপর একের পর এক বক্তৃতার মাধ্যমে দ্রুতই প্রসিদ্ধি লাভ করতে লাগলেন ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা।

এক জটিল বিতর্কের সমাধান

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) প্রধান যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছিলেন, তা হলো আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলির ব্যাখ্যা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে গ্রিক দর্শন ও গ্রিক যুক্তিবিদ্যার টানাহেঁচড়ায় কলঙ্কিত হয়ে পড়েছিল এ বিষয়টি। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করতে গিয়ে তৎকালীন কতক আলিম আবার ভুল করে বসেন। কুরআনের কিছু আয়াতের ভিন্নরকম ব্যাখ্যা দিতে থাকেন তারা। যেমন, আল্লাহ তাআলার হাত কিংবা আরশে সমাসীন হওয়া সংক্রান্ত আয়াতগুলো।

বিষয়টি কিন্তু খুবই জটিল ও বিপদজনক। ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একটু এদিক-সেদিক করে ফেললেই আকীদা কলুষিত হয়ে যাবে। এসবদিক বিবেচনা করে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা একটি সুন্দর সাদামাটা সমাধান দেন। তিনি বলেন,

[৬২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

“আমরা আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলির প্রতি ঈমান রাখি এবং তার সবটাই বিশ্বাস করি। যেমন, আল্লাহ তাআলার হাত। এর অস্তিত্বের ব্যাপারে আমরা বিশ্বাস করব, যেমনটা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু চারটা জিনিস আমরা করব না।

১। তা'তীল (অস্বীকার)। এর অর্থ আল্লাহ তাআলার হাত থাকাটাই অস্বীকার করা।

২। তাশবীহ (সদৃশ্য স্থাপন)। অর্থাৎ আল্লাহর হাতকে অন্য কোনো সৃষ্টির হাতের মতো বলা।

৩। তা'বীল (ব্যাখ্যা)। অর্থাৎ, নিজেদের বুঝমতো কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া।

৪। তাকয়ীফ (ধরন সাব্যস্ত করা)। আল্লাহর হাত কেমন, এই বিষয়ে মাথা ঘামানো।”

আমরা শুধুমাত্র ঈমান রাখব যে, আল্লাহ তাআলার হাত আছে। এর ধরন, প্রকৃতি, ব্যাখ্যার চিন্তা মাথাতেও আনব না। আল্লাহর মতো কিছুই নেই। তাই কোনোকিছুই আল্লাহর মতো নয়। এটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বিদা ও বিশ্বাস।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার সমকালীন বহু আলিম তাঁর অবস্থানকে সঠিক মনে করতেন না। তবুও ইমাম থেমে যাননি। তিনি স্রোতের বিপক্ষে কথা বলে লড়ে গেছেন হক্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। কৌশল অবলম্বনের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যাননি কিছু।

সাহসিকতা

কাতলুবেগ নামে মামলুকদের একজন সরকারি কর্মচারী ছিল। খুবই অত্যাচারী প্রকৃতির লোক। যেমন, কিছু কিনলে দশভাগের একভাগ দাম দিত। এরচেয়ে বেশি চাইলে মেরে তাড়িয়ে দিত। এরকমই এক ঘটনায় ন্যায্য মূল্য না পেয়ে এক দোকানদার কান্না করতে করতে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার (রহিমাহুল্লাহ) কাছে আসে। সোজা কাতলুবেগের ঘরে গিয়ে দরজায় করাঘাত করেন ইমাম। কাতলুবেগ দরজা খুললে ইবনু তাইমিয়্যা তাকে মূল্য পরিশোধ করে দরিদ্র লোকটির প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে বললেন। তখন কাতলুবেগ কী বলল শুনুন, সে বলল,

اذا كان الأمير بباب الفقير، فنعم الأمير ونعم الفقير

اذا كان الفقير بباب الأمير، فبأس الأمير وبأس الفقير

"ধনী যদি দরিদ্রের দরজায় যায়, তবে উভয়েই ভাগ্যবান। আর দরিদ্র যদি ধনীর দরজায় যায়, তবে উভয়েই হতভাগা।"

তার এই সুন্দর কথার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হলো ইবনু তাইমিয়্যাকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া। ভাবখানা এমন, "আপনি আলিম মানুষ, আমার কাছে কষ্ট করে এলেন কেন? এটা তো আপনার জন্য অপমানজনক। যান, আমিই পরে আপনার কাছে আসব।" এতে করে সেই দোকানদারের প্রাপ্য পরিশোধ করা থেকেও বেঁচে যেত সে।

কিন্তু সে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার যুক্তি ও বিচক্ষণতা সম্পর্কে জানত না। ইমাম তাকে সাথে সাথে বললেন,

لا تعمل علي دركواناتك ، موسى كان خيرًا مني ، وفرعون كان شرًّا منك ، وكان موسى كل يوم يجيء إلى باب فرعون مرات ، ويعرض عليه الإيمان

"বাপ-দাদার মতো দাসসুলভ আচরণ কোরো না (মামলুক বংশ আগে দাস ছিল)। শুনে রাখো, মুসা (আলাইহিস সালাম) আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং ফিরআউন তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু মুসা রোজ ফিরআউনের দরবারে তাকে ঈমানের দাওয়াত দিতে যেতেন। আমি তো তোমার কাছে মাত্র একবারই এসেছি।'[৬৩]

অগত্যা যার হক্ক তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হলো কাতলুবেগ। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহ এমনই সাহসী ছিলেন। তাঁকে কিছুতেই পরাজিত করা যেত না।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা তাতার অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে গিয়ে তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে বলেছেন। আওয়াজ তুলেছেন তাদের যিনা-ব্যভিচার, মদ্যপানের বিরুদ্ধে। তাদের মদের দোকান তিনি ভেঙে দিয়েছেন। এমনই ছিল তাঁর সাহসিকতা।

[৬৩] মুদাওয়াতুন নাফস, তাযকিরাতুল হুফফাজ, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

তাতারি-ত্রাসের মুকাবিলায়

হিজরি ৬৯৯তে আবারও তাতারদের আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। মানুষজন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তাতার আক্রমণের ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে মুসলিমরা ভালো করেই অবহিত। আশেপাশের বিভিন্ন শহর থেকে লোকেরা চলে আসতে লাগল রাজধানী দামেশকের দিকে। দামেশকে খবর এলো যে, মিশরের বাদশাহ তাঁর বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে দামেশকের মুসলিমদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছেন। যেন প্রাণের সাড়া জাগল নগরীতে। নতুন উদ্যমে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগল মুসলিমরা। কিন্তু একটা সমস্যা আছে। তাতার সম্রাট গাযান ও তার অনুগত সৈন্যরা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দেয়। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার ধর্মীয় বৈধতা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায় মিশর ও সিরিয়ার মুসলিম সৈন্যরা। তখন দামেশকের আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র ইবনু তাইমিয়্যা মামলুক ও সিরিয়ার সৈন্যদলের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা যদি আমাকেও তাতারীদের মাঝে পাও, এমনকি আমার মাথায় যদি পবিত্র কুরআনও থাকে, তবুও আমাকে নির্দ্বিধায় হত্যা কোরো।"

কিন্তু গাযানের কাছে পরাজিত হন মিশরীয় সম্রাট মুহাম্মাদ বিন ক্বালউন। দামেশককে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে মিশরে পালিয়ে যান তিনি। কাজী, আলেম ওলামা, সরকারি কর্মকর্তা, বড় বড় ব্যবসায়ী, এমনকি শহরের গভর্নরও মিশরের পথ ধরেন। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে রয়ে যায় কেবল দুর্গরক্ষক এবং জনগণের একাংশ। জিনিসপত্রের দামও অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল। গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে এলো জেলপালানো কয়েদির দল। সারা শহরে দিনরাত সমানে লুটতরাজ চালিয়ে যাচ্ছিল তারা।

গাযানের সেনাদলের দামেশক প্রবেশের সময়ও ঘনিয়ে আসছে। জনতা উভয় সংকটে পড়ে দিশেহারা। এ অবস্থায় ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা এবং শহরের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বসে একটা ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল গাযানের দরবারে উপস্থিত হয়ে নগরবাসীদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার ফরমান লিখে আনবে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা দামেশকের আতঙ্কগ্রস্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের নেতৃত্ব তুলে নিলেন নিজ হাতে। গাযান এবং ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার সেই কথোপকথন ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

রবিউস সানি মাসের তিন তারিখ। মহাপরাক্রমশালী তাতার সম্রাট গাযানের দরবারে

হাজির হলেন ইসলামের দূত ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ও তাঁর সঙ্গীগণ। গাযানের সামনে আদল, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি সম্পর্কিত কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে যাচ্ছিলেন ইমাম। তাঁর আওয়াজ ধীরে ধীরে বুলন্দ ও গুরুগম্ভীর হচ্ছিল। আয়াত ও হাদীস শোনাতে শোনাতে তিনি গাযানের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁদের মাঝখানে এক বিঘতও ফাঁক ছিল না। কিন্তু সবচাইতে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, প্রতাপশালী গাযান মোটেই বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করছিলেন না এতে। বরং তিনি নিবিষ্ট মনে কান লাগিয়ে সব কথা শুনছিলেন। মনে হচ্ছিল ইমাম তাকে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছেন।

গাযান পরে সভাসদদের জিজ্ঞেস করলেন, "এই আলেমটি কে? এনার চাইতে সাহসী ও দৃঢ়সংকল্প ব্যক্তি আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। কেউ এমন করে প্রভাবিত করতে পারেনি আমাকে।" তাঁকে ইমামের পরিচয় এবং ইলম, জ্ঞান ও কার্যবিবরণ সম্পর্কে অবহিত করা হলো। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা গাযানকে বললেন, "আপনি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করেন। কাজী, শায়খ ও মুয়াজ্জিনরাও আছেন আপনার সাথে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আপনি মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করেছেন। অথচ আপনার বাপ দাদা কাফের হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের কাজ করতে ইতস্তত করতেন। তারা নিজেদের ওয়াদা পালন করেছেন। আর আপনি ওয়াদা ভেঙেছেন। জুলুম করেছেন আল্লাহর বান্দাদের ওপর।"

প্রধান বিচারপতি আবুল আব্বাস ইমামের সঙ্গে ছিলেন। তিনি লিখেছেন, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ও তাঁর সঙ্গীদের সামনে খাবার রাখা হলো গাযানের মজলিসে। সবাই খেতে লাগলেন কিন্তু ইমাম হাত গুটিয়ে নিলেন। খাচ্ছেন না কেন জিজ্ঞেস করা হলে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, এ খাবার তো হালাল নয়। কারণ গরীব মুসলিমদের থেকে লুট করা ভেড়া ও ছাগলের গোশত থেকে এ খাদ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আর রান্নায় ব্যবহৃত হয়েছে মজলুম মানুষের গাছ থেকে জোর করে সংগ্রহ করা কাঠ।

গাযান তাঁকে বললেন, "আমার জন্য দুআ করুন।" ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহ দুআ করতে লাগলেন, "হে আল্লাহ! আপনি ভালো জানেন। যদি গাযানের এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হয় আপনার কালেমাকে বুলন্দ করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা, তা হলে তাকে সাহায্য করুন। আর যদি হয় দুনিয়ার রাজত্ব লাভ এবং লোভ লালসা চরিতার্থ করা, তা হলে আপনিই তার সাথে বোঝাপড়া করুন।" আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ইমামের দুআর সাথে গাযান আমীন বলে যাচ্ছিলেন।

কাজী আবুল আব্বাস আরও লিখেছেন যে, ইমামের বক্তৃতার সময় তারা ভয়ে জামাকাপড় গুটিয়ে নিচ্ছিলেন। কারণ, কখন যে ইমামের ওপর জল্লাদের তরবারি ঝলসে ওঠে আর তাঁর রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় বাকিদের পোশাক। কিন্তু ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) গাযানের দরবার থেকে ফিরে আসেন অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে। নগরবাসীদের জন্য লিখিয়ে আনেন নিরাপত্তার পরোয়ানা। তাতাররা যেসব মুসলিমকে বন্দি করেছিল, তাদের ছাড়িয়ে আনেন। তাতারীদের বর্বরতার কাহিনি তিনি অনেক শুনেছিলেন। নিজের চোখে দেখেছিলেনও অনেক। কিন্তু সেসব তাঁকে একটুও বিচলিত করতে পারেনি। তাতারী সম্রাটের সাথে মুখোমুখি কথা বলতে এবং তাদের সেনাদের মধ্যে অবাধে চলাফেরা করতে তিনি একটুও ভীতি অনুভব করেননি। তিনি বলতেন, যার অন্তরে কোনো রোগ আছে, একমাত্র সে-ই গাইরুল্লাহকে (স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে তার সৃষ্টিকে) ভয় করতে পারে।

আবারও তাতারি-ত্রাস

গাযানের কাছ থেকে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) নিরাপত্তার পরোয়ানা লিখিয়ে আনলেও নগরবাসীদের মনে স্বস্তি ছিল না। তারা যে ভয় করছিল, বাস্তবে হলোও তা-ই। তাতাররা নগরে প্রবেশ করেনি ঠিকই, কিন্তু নগরের বাইরে তারা ছাউনি করে পড়ে রইল। শহর প্রাচীরের বাইরের শহরতলীতে চলতে লাগল তাদের অবাধ লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞ। এটি তাতারী সেনাদের বহুদিনের গড়ে তোলা অভ্যাস। হত্যা ও লুটতরাজ ছাড়া যেন তাদের বিজয় সম্পন্ন হয় না।

শহরের বাইরের সমগ্র এলাকা দস্তুরমতো একটা যুদ্ধক্ষেত্র। সশস্ত্র তাতার সেনারা দল বেঁধে জনপদে ঢুকে পড়েছে, লুকোনো সম্পদ বের করে দেবার জন্য গৃহকর্তার হাত পা বেঁধে বেদম প্রহার চালাচ্ছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে আছাড় মারছে। চারদিকে মজলুমের কানফাটা আর্তনাদ ও কাকুতি মিনতি।

সাইফুদ্দীন কুবজুক নামে একজন তুর্কি বংশোদ্ভূত নও-মুসলিম তাতারীকে নগরের নতুন শাসনকর্তা নিযুক্ত করে নগরে পাঠিয়ে দিলেন গাযান। কুবজুক নগরবাসীদের ওপর একের পর এক চাপ সৃষ্টি করে চলল। শহর এখন পুরোপুরি তাতারদের নিয়ন্ত্রণে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া আরও একবার গাযানের সাথে দেখা করতে মনস্থ করলেন। আবেদন নিয়ে গেলেন রবিউস সানী মাসের ২৫ তারিখে। কিন্তু দুদিন ধরে অপেক্ষা করার পরও তাঁকে সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হলো না।

ইত্যবসরে দামেশকে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, তাতারীরা এবার শহরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল শহরে। মানুষ নগর ছেড়ে বাইরে চলে যেতে চাইল। কিন্তু যাবে কোথায়? চারদিকেই তাতারদের অবরোধ। তাতাররা কেল্লা জয় করার ব্যবস্থা করছে। কেল্লার চারদিকে খনন করছে পরিখা। মিনজানিক বসাল কেল্লার প্রাচীরে পাথর নিক্ষেপ করে ফাটল ধরাবার জন্য। লোকেরা ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিলো। কারণ তাতারীরা পথেঘাটে কাউকে দেখলেই তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেগার খাটাতে শুরু করে। তাদেরকে দিয়ে পরিখা খনন করায়।

ইবনু কাসীর তাঁর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে লিখেছেন, পথঘাট একেবারে সুনসান হয়ে গিয়েছিল তখন। কদাচিৎ এক দুজনকে দেখা যেত। জামে মাসজিদে একবারেই কমে গেল নামাজিদের সংখ্যা। জুমার সালাতে উমাওয়ী গ্র্যান্ড মাসজিদে বড়জোর একটি কাতার পূর্ণ হতো। যে ব্যক্তি নেহায়েত প্রয়োজনে বাইরে বের হতো, সেও তাতারদের পোশাক পরে নিত। চটপট কাজ সেরে নিয়ে সোজা ঘরে ফিরত সে। গাযান তার সেনাবাহিনী নিয়ে ইরাকের দিকে রওয়ানা দিলেন। সিরিয়ায় রেখে গেলেন নিজের প্রতিনিধি এবং তার অধীনে ষাট হাজার তাতার সৈন্য।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বারবার মিশরের শাসক নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ কালাউনের কাছে চিঠি লিখে তাকে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করেন। ৭০২ হিজরিতে আবার তাতারীদের আক্রমণের খবর শোনা গেল দামেশকে। প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন সুলতান নাসিরুদ্দিন কালাউন। সেনাবাহিনী নিয়ে সিরিয়ার পথে রওনা হলেন জিহাদের নিয়তে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাও হলেন সেনাবাহিনীর সহযোগী। কিন্তু সিরিয়ায় পৌঁছে তারা শুনলেন তাতারীরা ফিরে গেছে। শহরে আর একটিও তাতার দেখা গেল না। সেনাবাহিনীও ফিরে গেল মিশরে। কিন্তু ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা দামেশকে থেকে গেলেন।

এসময় দামেশকে কোনো দায়িত্বশীল গভর্নর বা শাসক ছিল না। তাতার হামলায়

নগর প্রাচীর স্থানে স্থানে ভেঙে পড়েছিল। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহ আবারও নেতৃত্বের গুণাবলি দেখিয়ে দিলেন এই কঠিন সময়ে। ৭০০-৭০২ হিজরিকালে দামেশকের মুসলিমদের তিনিই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) ভ্রান্ত ধ্যানধারণার বুদ্ধিবৃত্তিক খণ্ডনকে তাতারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান করতেন। যেমন- ইবনুল আরাবির আক্বীদা সংক্রান্ত ধারণা প্রত্যাখান করেন তিনি। ইবনুল আরাবীর মতবাদের নাম 'ওয়াহদাতুল ওজুদ'। অর্থাৎ, সৃষ্টিতেই স্রষ্টার অস্তিত্ব। ইবনুল আরাবী বলতেন, "আল্লাহ আমার মধ্যে, আমি আল্লাহর মধ্যে।" ইবনু তাইমিয়্যা এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সর্বেশ্বরবাদী মতবাদ *(pantheism)* এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণের এ ধরনের যাবতীয় গোমরাহির বিস্তারিত তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করেন।

ইসলামের নামে প্রচলিত এসব ভ্রান্ত মতবাদের কঠোর সমালোচনা ইবনু তাইমিয়্যাকে কিছু লোকের শত্রু বানিয়ে ফেলল। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে একদল তথাকথিত তাত্ত্বিক। এক পর্যায়ে তারা সরকারের সহায়তা লাভ সমর্থ হয়। মিশরের তদানীন্তন শাসককে তারা ইবনু তাইমিয়্যার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। কারণ মিশরের শাসক রুকনুদ্দীন বাইবার্স ছিলেন ইবনুল আরাবীর মতবাদের অনুরক্ত। আর সে সময় সিরিয়া ও মিশর ছিল একই রাষ্ট্রভুক্ত। রাজধানী মিসরের কায়রোয়। আর সিরিয়া ছিল মিসরেরই অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ।

চক্রান্তকারীরা সহজেই রুকনুদ্দীন বাইবার্সকে প্রভাবিত করে ফেলে। ইবনু তাইমিয়্যাকে আখ্যা দেয় ফিতনাবাজ লোক হিসেবে। মূলত তারা ইবনু তাইমিয়্যাকে হাতের কাছে পেতে চাচ্ছিল। ৭০৫ হিজরির কোনো এক মাসে মিসর থেকে বিশেষ শাহী ফরমানের মাধ্যমে ইবনু তাইমিয়্যাকে কায়রোয় চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রমাদ গোনেন ইমামের ছাত্র ও বন্ধুমহল। গভর্নরও বাধা দেন তাঁকে। তিনি সুলতানের সাথে পত্র ও দূতের মাধ্যমে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করার এবং তাঁর ভুল ধারণা দূর করার দায়িত্ব নিতে চান। কিন্তু ইমাম কারোর অনুগ্রহ গ্রহণ করতে চাননি। সবার ভীতি ও আশঙ্কাকে পেছনে রেখে তিনি রওয়ানা হন কায়রোর পথে।

তিনি মিশরে পৌঁছেন ২২শে রমযান জুমার দিন। কেল্লার জামে মাসজিদে সালাত পড়ার পর আলোচনা শুরু করতে চান। কিন্তু অনুমতি দেওয়া হয়নি তাঁকে। সেখানেই জনতাকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। বলা হয় যে, তাঁর চিন্তা-আকীদা ইসলামবিরোধী। তাই জনতাও তাঁর কথা শুনতে প্রস্তুত নয়। কাজী ইবনু মাখলুফ মালেকীর নির্দেশে তাঁকে কয়েকদিন আটক রাখা হয় কেল্লার বুরুজে। ঈদের রাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মিশরের কারাগারে। পরের বছর ৭০৬ হিজরির ঈদের রাতে গভর্নর এবং কয়েকজন কাজী-ফকীহের পক্ষ থেকে ইমামকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চলে। তাদের কেউ কেউ এজন্য ইমামকে তাঁর আকীদা থেকে তওবা করার শর্ত আরোপ করেন। এতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানান ইবনু তাইমিয়্যা। এ ব্যাপারে ছয়বার তাকে ডাকা হয় সরাসরি এসে কথা বলার জন্য। কিন্তু তিনি সাড়া দেননি এ ডাকে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহ কারাগারে এসে দেখেন কয়েদিরা নিজেদের মন ভোলাবার জন্য নানারকম আজেবাজে কাজে মত্ত। কেউ তাস, কেউ দাবায় মশগুল। সালাত কাযা হয়ে যাচ্ছে খেলার ঝোঁকে। ইমাম শুরু করেন তাঁর সংস্কার-কার্যক্রম। কয়েদিদেরকে আল্লাহর আদেশ, সালাত, সৎকাজ, তাওবা ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট করেন তিনি। কিছুদিনের মধ্যে কয়েদিদের মাঝে দ্বীনি ইলমের এমন চর্চা শুরু হয়ে গেল যে, সমগ্র জেলখানাটিই পরিণত হলো মাদ্রাসায়। কারাগারের কর্মচারী ও কয়েদিরা ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাকে মনেপ্রাণে ভালোবেসে ফেলে। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, সাজার মেয়াদ শেষেও জেলখানা ছেড়ে যেত চায় না কয়েদিরা। স্রেফ ইবনু তাইমিয়্যার কাছে আরও কিছুদিন থাকার জন্য।

এক বছর পরে কারামুক্তি পেলে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা মিশরেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মিশরেও তখন ছড়িয়ে পড়েছে বহুশ্বরবাদী ধ্যানধারণা। অবিরত সেসব মতবাদ খণ্ডন করতে থাকেন তিনি। যখনই তিনি এসবের বিরুদ্ধে নামেন, তখনই তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। এভাবে যতবারই তাকে কারাগারে পাঠানো হয়, ততবারই মুক্ত হয়ে এসে একই কাজ করতে থাকেন তিনি।

তখন আরও একটি মতবাদ প্রচলিত ছিল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে দুআ করা যায়, যেকোনো কিছু চাওয়া যায়। দরবেশ থেকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত যে কেউ। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা এসবের বিরুদ্ধেও বলেন। বিস্তর লেখালেখি করেন এ নিয়ে। যথারীতি তাঁকে নেওয়া হয় কারাগারে। কখনও আপন গৃহে নজরবন্দি করে রাখা হয়। তাঁকে আলেকজান্দ্রিয়ায় নির্বাসন দেন রুকনুদ্দীন

বাইবার্স। আলেকজান্দ্রিয়ায়ও একদল কট্টর সুফিপন্থিদের দেখা পান, যাদেরকে 'আস সাবহানিয়াহ' বলা হতো। তিনি সেখানে গিয়ে তাদের ভ্রান্ত আকীদা থেকে ফিরিয়ে আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

তালাকের মাসআলা সংক্রান্ত একটি মতপার্থক্যের কারণেও কারাগারে নেয়া হয়েছিল ইবনু তাইমিয়্যাকে। অন্যান্য সকল মাযহাবের মতে, এক বৈঠকে কেউ তিন তালাক দিলে স্ত্রী চিরতরে তালাক হয়ে যাবে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা বিরোধিতা করে বললেন যে, তিনটি আলাদা আলাদা বৈঠকে তিনবার তালাক বললে এমন হবে। তারপর ইদ্দতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তারপর কার্যকর হবে তালাক। অন্যথায় নয়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহর এই মত অনেক সালাফদেরও ছিল। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবেরও (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ছিল একই মত। এই মতভেদের কারণ ছিল যেন মানুষ তালাক নিয়ে খেলা করতে না পারে। যখন তখন যত্রতত্র তালাক দিতে না পারে। কিন্তু ইবনু তাইমিয়্যার এই মত ছিল অন্যান্য সকল মাযহাবের বিপক্ষে। তাই তাকে আবারও পাঁচ মাসের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

শত্রুর প্রতি দয়া

কারাগারকে মাদরাসায় পরিণত করার সেই ঘটনার এক বছর পরই কারামুক্ত হন ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ)। মুক্ত হয়ে দেখলেন যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের মনে তাঁর প্রতি অগাধ ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন। ইসলামের অপব্যাখাকারী শত্রুদের সামনে বজ্রকঠিন এ মানুষটি আসলে ছিলেন বিনয়ী, কোমলপ্রাণ এবং প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী। ঠিক যেমন কোমলতম হৃদয়ের অধিকারী মুহাম্মাদ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তাআলার আদেশের ক্ষেত্রে ছিলেন আপসহীন।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা মিম্বারে ফিরে গিয়েই তাঁর ওপর জুলুমকারী প্রত্যেককে প্রকাশ্যে মাফ করে দেন। বলেন,

> "আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি রহম করুন। আমি কখনও কোনো মুসলিমের অনিষ্ট চাইনি। তাহলে আমি কীভাবে আমার বন্ধুবান্ধব, আলিমগণ এবং মুসলিম ভাইদের ব্যাপারে এই কামনা করতে পারি যে, তারা আমার কারণে দুঃখে পড়বে? কারও বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই, কোনো

প্রতিশোধের ইচ্ছা নেই। সকলকেই মাফ করে দিলাম। আমার ভালোবাসা তাদের সকলের জন্যই।"

রুকনুদ্দীন বাইবার্সের শাসনকালের মেয়াদ ছিল মাত্র এক বছর। এরপর নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু কালাউন আবারও শাসক হন। ইবনু তাইমিয়্যাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় অন্তরীণ করার ষড়যন্ত্রে যেসব আলিম শরিক ছিলেন, ইতঃপূর্বে সুলতান নাসিরুদ্দিনের ক্ষমতাচ্যুতির পেছনেও ছিল তাদের চক্রান্ত। সুলতান এ কথা ভুলতে পারছিলেন না। কঠিন প্রতিশোধের পরিকল্পনা করেন তিনি। সুলতান এই গাদ্দার কাযী ও আলেমদের হত্যা করার বৈধতা লাভের জন্য ইবনু তাইমিয়্যার কাছ থেকে ফাতওয়া সংগ্রহ করতে চাইলেন। তাদের ফাতওয়া দেখিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইলেন ইমামকে।

কিন্তু ইমাম তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেই কাযী ও উলামায়ে কেরামের নানা প্রসঙ্গ তুলে তাদের প্রশংসা করতে থাকলেন। কঠোর বিরোধিতা করলেন সুলতানের প্রস্তাবের। তিনি সুলতানকে বোঝাতে থাকলেন যে, দেশের এই শ্রেষ্ঠ আলেমদের হত্যা করার পর এদের কোনো বিকল্প পাওয়া যাবে না। অত্যন্ত মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হবে দেশ ও জাতি। তারা আপনাকে হত্যা করার জন্য বারবার ষড়যন্ত্র করছে। তারা আপনাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। বললেন যে, কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে থাকলে তাদের প্রতিশোধ নেবার জন্য আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট। এভাবে ইমামের অবিরত চেষ্টায় শেষে সুলতানকে নিরস্ত হতে হলো। উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে নিজের ক্রোধ দমন করলেন তিনি। এক বিরাট রক্তপাত থেকে বেঁচে গেল মিশর। মিশরের সবচেয়ে বড় কাযী ইবনু মাখলুকের একটি বিবৃতি ঐতিহাসিক ইবনু কাসীর উদ্ধৃত করেছেন। কাযী সাহেব বলেন,

> "ইবনু তাইমিয়্যার মতো এত বড় উদার হৃদয় ব্যক্তি আমি আর দেখিনি। আমরা তার বিরুদ্ধে সরকারকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলাম। কিন্তু তিনি যখন এর শোধ নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করলেন, তখন আমাদের মাফ করে দিলেন। শুধু তা-ই নয়, সুলতানের কাছে সাফাইও গাইলেন আমাদের পক্ষ থেকে।[৬৪]

সুলতানের দরবার থেকে ফিরে এসে ইমাম আবার তাঁর পুরাতন কাজে লেগে যান। দরসপ্রদান, বক্তৃতা এবং ফতোয়া দান ও গ্রন্থ রচনা। তবে দামেশকের জনগণের মাঝে ইমামের যে মর্যাদা ছিল, কায়রোতে তা হয়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগে।

[৬৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

কাজেই শুরুর দিকে সেখানকার মুসলিম জনতাকে ইমামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা কঠিন ব্যাপার ছিল না। ৭১১ হিজরি ৪ রজব কতিপয় দুর্বৃত্ত তাঁর ওপর আক্রমণ চালিয়ে আহত করে। সঙ্গে সঙ্গেই এর প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরি হয়ে যায় মহল্লার লোকেরা। কিন্তু ইমাম তাদের নিবৃত্ত করেন। উপস্থিত জনতাকে বলেন, "প্রথমত, তাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া আমার হক। আমি সর্বসমক্ষে আমার এ হক প্রত্যাহার করলাম। দ্বিতীয়ত, এটা তোমাদের হক হতে পারে। যদি আমার পরামর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রতিশোধ নিতেই চাও, তাহলে তোমাদের ব্যাপার। আমার কিছু বলার নেই। তৃতীয়ত, এটা আল্লাহর হক। আর আল্লাহ তাঁর ইচ্ছে আদায় করেই নেবেন।" এ সময় আসরের আযান হয়ে গেলো। ইমাম মহল্লার মাসজিদে যাবার জন্য বের হয়ে পড়লেন। নিরাপত্তার কথা ভেবে বাধা দিতে চাইল লোকেরা। কিন্তু কোনো বাধা শুনলেন না তিনি। ফলে একটি বিরাট দলও তাঁর সংগ নিল। তিনি সসম্মানে সালাত পড়ে এলেন মাসজিদ থেকে।

সর্বশেষ কারাবরণ

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) সতেরো বছর আগে একটি মত দিয়েছিলেন যে, ইবাদাতের উদ্দেশে মাযারে গেলে কোনো সাওয়াব নেই। এমনকি আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজা মুবারাকেও না। তিনি তাঁর মতের পক্ষে এই হাদীসটি দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন,

لاَ تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى

"(সাওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করতে পারবে কেবল তিনটি মাসজিদে। আমার এ মাসজিদ, মাসজিদুল হারাম এবং মাসজিদুল আকসা।"[৬৫]

এই ফতোয়া তিনি যখন দিয়েছিলেন, তখন সবাই মাযার যিয়ারতকে সাওয়াবের কাজ মনে করতো। পুরোটাকেই ইবাদাতের অংশ ভাবতো।

কিন্তু ইবনু তাইমিয়্যার বিরোধীরা সতেরো বছরের পুরনো এই ফতোয়া টেনে এনে

---

[৬৫] সহীহ মুসলিম

মানুষকে ইমামের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়। আবারও কারাগারে নিক্ষেপ করায় তাঁকে।

এবার কারাগারে থাকা অবস্থায় ইমাম একদিকে যেমন ইবাদাত ও কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে যান, অন্যদিকে ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনায়ও মন দেন আরও বেশি করে। কুরআনের জটিল রহস্যগুলো উন্মোচনে আরও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কারাগারের নিরুপদ্রব পরিবেশ তাঁকে নিবিষ্ট চিত্তে কুরআন অধ্যয়ন ও গবেষণার সুযোগ করে দেয়। আশিবার কুরআন খতম করেন কারাগারে বসেই। যেসকল মতবাদের বিরোধিতার কারণে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোর বিরুদ্ধেও লিখতে থাকেন সমানে।

এখানে বসে বসে তিনি যা কিছু লিখতেন, কিছুক্ষণের মধ্যে কারাগারের বাইরে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়তো তা। মানুষ ফতোয়া জানতে চেয়ে চিঠি লিখে পাঠাতো তাঁর কাছে। কারাগারে বসে তিনি তার জবাব লিখে বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। জেলের ভেতর ও বাহির সমান হয়ে দাঁড়াল তাঁর জন্য। এখন বরং আগের চেয়েও নিরাপদ। নতুন করে কারাগারে যাওয়ার ভয় নেই।

তা দেখে ইমামের বিরোধীরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। তাই তারা শাসককে বলে তাঁর বই-খাতা-কলম কেড়ে নেয়। কিন্তু শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) কি এত সহজে হার মানবেন? তা কী করে হয়! তিনি চক দিয়ে কারাগারের দেয়ালে লিখতে শুরু করেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখলেন,

"আমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো, মানুষের আদেশ উপেক্ষা। সেই আদেশ তো মানুষেরই, হোক সে কোনো শাসক বা রাজা। তার সেই আদেশ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের আদেশের বিপরীত হলে তার আনুগত্য কখনোই করা যাবে না। এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের আদেশের বিপরীত কোনোকিছুর আনুগত্য কখনোই জায়েয নয়।"

কারাগারে প্রায় ২৩ দিন অসুস্থ ছিলেন তিনি। দামেশকের গভর্নর তখন ইমামের কাছে মাফ চাইতে আসেন। আসলে সবাই জানতো যে, ইমাম ইবনু তাইমিয়া একজন নিষ্কলুষ মানুষ, আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং সত্যিকার আলিমে দ্বীন। শীঘ্রই তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন। এখনই মাফ চেয়ে না নিলে আখিরাতে বিপদ হবে। মহৎপ্রাণ ইবনু তাইমিয়া বলেন,

"আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আপনাকেও মাফ করে দিয়েছি, আমার শত্রুদেরও তা-ই। আমার বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডের সত্যতা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো প্রকার সন্দেহ ছিল না এবং এখনও নেই। সুলতানকেও মাফ করে দিয়েছি আমি। কারণ সুলতান স্বেচ্ছায় নয় বরং উলামায়ে কেরামের ফতোয়ার কারণে আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। তবে সেই ব্যক্তিকে আমি কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারিনা, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শত্রু। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের প্রতি আক্রোশের বশবর্তী হয়ে যারা আমার বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছে। আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে।"

ইবনুল কাইয়িমের সাক্ষ্য

ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার (রহিমাহুল্লাহ) প্রথম ছাত্র। ইমামের মৃত্যুর পর তিনিই ইমামের কাজগুলো চালু রাখেন। তিনি ইমামের একটি বক্তব্য তাঁর গ্রন্থে লিখেন,

ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي في قلبي، وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة.

"আমার শত্রুরা আমার কীইবা করতে পারবে? আমার জান্নাত তো আমার অন্তরে। আমি যেখানেই যাই, সে আমার সাথে সাথেই থাকে। আমার থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়না সেটা। কারাগার আমার ইবাদাতের জন্য নির্জন আশ্রয়স্থল, মৃত্যুদণ্ড আমার জন্য শাহাদাতের সুযোগ, আর দেশ থেকে নির্বাসন হচ্ছে আমার জন্য এক আধ্যাত্মিক ভ্রমণ।"[৬৬]

ইবনু তাইমিয়্যার কাছে যখনই কারাগারের ফরমান আসতো, তিনি বলতেন,

أنا كنت منتظرا لذالك وفيه خير عظيم

"এর অপেক্ষাতেই ছিলাম। এতেই আমার কল্যাণ।"

---

[৬৬] আল ওয়াবিল

কারাগারে থাকাকালীন একবার তিনি বলেছিলেন,

"এই দূর্গ তৈরি করতে যে সম্পদ খরচ করা হয়েছে, তা কখনোই আমার অন্তরের প্রশান্তির সমান হবে না। আল্লাহ তাআলার শোকর যে, তিনি আমাকে কারাগারে থাকার সৌভাগ্য দান করেছেন।"

ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ওস্তাদ সম্পর্কে বলেছেন,

"এতকিছুর পরেও আমি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার মতো কাউকে দেখিনি। কত কষ্ট, যাতনা তিনি সহ্য করেছেন। তারপরেও দুনিয়ার বিলাসিতায় ডুবে যাননি। তিনি কারাবন্দি ছিলেন, তাঁকে নানান হুমকি দেয়া হয়েছে, তাঁর উপর হামলা হয়েছে। এতকিছুর পরেও কী যে ভালো থাকত তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য! তাঁর চেয়ে সুখী হৃদয় আর স্থিতিশীল অন্তরের অধিকারী কাউকেই পাইনি।"

ইন্তিকাল

৭২৮ হিজরির ২২ জিলকদ ৬৭ বছর বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিন শাইখুল ইসলাম (রহিমাহুল্লাহ)। দুর্গের মুয়াজ্জিন মাসজিদের মিনারে উঠে তাঁর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন। দুর্গের চারদিকের উঁচু বুরুজগুলো থেকে সমস্বরে এ ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। শহরের মাসজিদগুলো থেকে ইথারে ইথারে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে শোকবার্তা। মুহূর্তে শহরের সমস্ত আনন্দ কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যায়। শোকের ছায়া নেমে আসে অলিতে গলিতে, রাজপথে, গৃহকোণে, মানুষের মুখে চোখে, আর হৃদয়ে।

দুর্গের পথে ঢল নামে শোকাহত মানুষের। শত্রুরাও শত্রুতা ভুলে যায়। তারাও মূর্ছিত, বেদনাহত। খুলে দেওয়া হয় দুর্গের সদর দরজা। মানুষ দলে দলে যেতে থাকে ইমামের মরদেহ এক নজর দেখে হৃদয়ের শোকাবেগকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও প্রশমিত করতে। ইমামের চেহারায় চুমু খেতে চাচ্ছিল সকলেই। গোসলের পর জানাজার জন্য শহরের বৃহত্তম মাসজিদ উমাইয়া গ্র্যান্ড মাসজিদে আনা হয় মরদেহ। দুর্গ ও মাসজিদের মধ্যকার দীর্ঘ রাজপথ লোকে লোকারণ্য। ভিড় থেকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় লাশ জামে মাসজিদে আনা হয়। বলা হয়, জানাযায় অংশ

নেয় প্রায় দশলাখ লোক। মাসজিদ ভরে গিয়ে সামনের ময়দান, রাজপথ, আশপাশের অলি গলি, বাজার সব লোকে ভরে যায়।

ঐতিহাসিকদের মতে ইতিপূর্বে ইসলামী বিশ্বের আর কোথাও এত বড় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়নি। এদিন শহরের দোকান পাট সব বন্ধ থাকে। বহু লোক রোজা রাখে এবং বহু লোক খাবার কথা ভুলে যায়। মরদেহ গোরস্তানের দিকে নিয়ে যাবার সময়ও চলা কঠিন হয়ে পড়ে ভিড়ের কারণে। ফজরের পর দুর্গ থেকে মরদেহ বের করা হয়। জানাজার সালাত অনুষ্ঠিত হয় যোহরের পর। জনতার ভিড় ঠেলে নিকটবর্তী গোরস্তানে পৌঁছতে হয়ে পড়ে আসরের ওয়াক্ত। অতি অল্প সময়ে ইমামের মৃত্যু সংবাদ সারা ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু মিশর ও দামেশক নয়, ইয়েমেন ও চায়নাতেও ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) ইসলামের এক মুজাদ্দিদ ছিলেন। যেসময় ইসলামের অগ্রযাত্রা থেমে গিয়েছিল, সেসময় এই মহান আলিমের উসীলায় ইসলামকে আল্লাহ তাআলা স্থবির অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছেন।

আল্লাহ তাআলা এই মহান ইমামকে ক্ষমা করুন, তাঁর প্রতি দয়া করুন।

ক্রুসেডের চেয়েও বিশাল

সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী (রহিমাহুল্লাহ)

সুলতান সালাহ উদ্দীনের (রহিমাহুল্লাহ) পুরো নাম সালাহ উদ্দীন আবুল মুজাফফর ইউসুফ ইবনু আল আমির নাজমুদ্দীন আইয়ুব ইবনু শাফি ইবনু মারওয়ান ইবনু ইয়াকুব আদ-দুয়াইনি জেনগি তিকরিত। জন্মগ্রহণ করেন ৫৪৪ হিজরি সনে অর্থাৎ ১১৩৭ খ্রিস্টাব্দে।

সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর কথা উঠলেই আলোচনা প্রায়সময় ক্রুসেড এবং ক্রুসেডারে আটকে থাকে। এখানে আমরা বরং সালাহুদ্দীনের ব্যক্তিত্বকে জানার চেষ্টা করবো।

পিতার হাতে গড়া

সালাহ উদ্দীন ছিলেন তাঁর পিতা নাজমুদ্দীনের প্রিয় পুত্র। পিতা-পুত্র একসাথে পোলো খেলতেন, সময় কাটাতেন। শৈশবেই জ্ঞান অর্জনের জন্য তাঁকে বিভিন্ন আলিমের মজলিসে পাঠাতেন নাজমুদ্দীন। সেখানে তিনি পুরোপুরি আরবি ভাষা শেখেন এবং শাফিঈ মাজহাবের ফকীহগণের নিকট ফিকহের জ্ঞানার্জন করেন। অর্থাৎ সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী কেবল মুজাহিদই ছিলেন না, একই সাথে ছিলেন ইসলামের জ্ঞানসাধকও। জিহাদ করতে হলে শুধু যুদ্ধের নিয়ম নয়, জিহাদের ইসলামী মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরি। নাজমুদ্দীন তাঁর ছেলেকে এভাবেই গড়ে তোলেন।

কিছু মানুষ ব্যক্তিগত ইবাদাতে অত্যন্ত যত্নবান। প্রতি ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে আদায় করে থাকেন। কিন্তু জিহাদের ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা রাখেন না বা জিহাদকে অপছন্দ করেন। আবার কেউ জিহাদের ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন কিন্তু

সালাতে অলসতা করেন। কোনোটাই ঠিক নয়। ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবন উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী একদিকে ছিলেন ময়দানের প্রথম সারির বীর সিপাহী, অপরদিকে আমলী জীবনেও পাবন্দ।

অন্যায় করপ্রথা বিলোপ

সালাহ উদ্দীন মিশরের ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে সেখানকার শাসক ছিল ফাতেমী রাজবংশ। তাদের শাসনকালে সাধারণ জনগণের ওপর বিশাল বিশাল করের বোঝা আরোপ করা হতো। এমনকি ছোটখাটো জিনিস কেনাবেচার জন্যও দিতে হতো কর। সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী (রহিমাহুল্লাহ) ক্ষমতায় আসার পর বেশিরভাগ কর থেকেই সাধারণ জনগণকে মুক্তি দেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব

রাজা-বাদশাহরা সাধারণত সরাসরি ময়দানে না গিয়ে দিক-নির্দেশনা দেন তাঁবু থেকে। কিন্তু সালাহ উদ্দীন (রহিমাহুল্লাহ) যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যদের সাথে সম্মুখ সারিতে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। তাঁর যুদ্ধকৌশলও ছিল হঠকারিতাবিহীন, প্রজ্ঞাপূর্ণ।

আক্রার যুদ্ধের সময় একদিন ক্রুসেডারদের ১৭ টি জাহাজ একে একে আসতে থাকে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে। সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী কোনো রকম তাড়াহুড়ো না করে ঠাণ্ডা মাথায় জাহাজগুলোকে আসতে দেন। অপেক্ষা করেন সবকটি জাহাজ আসা পর্যন্ত। তারপর মুসলিম সৈন্যদেরকে পর্বতে অবস্থানের নির্দেশনা দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেন তিনি। ঝড়-বৃষ্টি সবমিলিয়ে সে দিনটি ছিল বেশ সংকটপূর্ণ। এত বিপত্তি ও শত্রুসংখ্যা সামলেও সেদিন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে মুসলিমরা।

ধৈর্য ও সহনশীলতা

খুব কাছের মানুষের মৃত্যু হলে সবারই আচরণে একটু না একটু বিচলিত ভাব আসে। আর যদি ঘাড়ের ওপর থাকে বিশাল সাম্রাজ্যের দায়িত্ব, তাহলে তো কথাই নেই।

সালাহ উদ্দীনের জীবদ্দশাতেই তাঁর পুত্র ইসমাঈলের মৃত্যু হয়। এ সংবাদ শুনে তিনি আর কাউকে বলেনওনি। আহাজারি করা তো দূরের কথা। শুধুমাত্র নীরবে অশ্রুপাত করেছেন। এ থেকেই বুঝা যায় সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী (রহিমাহুল্লাহ) কী পরিমাণ ধৈর্যবান ছিলেন। একজন প্রকৃত মুসলিম কেবল মহান আল্লাহ তাআলার কাছেই শোক দুঃখ প্রকাশ করেন, অন্য মানুষের কাছে না।

ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে শাসক হিসেবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল। জনগণ তাঁর কাছে সালতানাতের অন্যান্য রাজ্যপাল এবং কর্তাব্যক্তিদের বিরূদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ অনুযোগ নিয়ে আসত। কর মওকুফের আবেদন করত কেউ। তিনি মাদুর পেতে বসে সকলের কথা শুনতেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ থাকত বেশ ক্ষুব্ধ ও রূঢ়ভাষী। কারো কারো পায়ের ধুলোবালিতে তাঁর কাপড় এবং তার মাদুর নোংরা হয়ে যেত এসময়।

তখনকার দিনে এটা ছিল অবিশ্বাস্য। কারণ কোনো আমীর বা সুলতান তো দূরের কথা, তাদের প্রতিনিধি-কর্মচারীর সামনে মুখ খোলার সাহস দেখানোর অর্থই ছিল বিপদ ডেকে আনা। বরং আজকের দিনেও তা-ই। কোনো সরকারী কর্মকর্তার সামনে কিছু বলার চিন্তাও করা যায় না। অথচ সালাহ উদ্দীন ধৈর্য সহকারে সরাসরি জনগণের কথা শুনতেন। দিতেন প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা। একজন স্বাধীন সুলতানের জন্য এটা খুব সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তিনি জানতেন যে, প্রজাদের ব্যাপারে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

মিত্র ও শত্রুর প্রতি মহানুভবতা

সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন সৌজন্য এবং মহানুভবতার মূর্ত প্রতীক। একদিকে তিনি যেমন ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুসলিম ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করতেন, অপরদিকে ওই ক্রুসেডার শাসকের নির্যাতন থেকে রক্ষা করতেন সাধারণ খ্রিষ্টান জনগণকে। ইংরেজ ইতিহাসবিদ মিল একটি ঘটনার বর্ণনা দেন-

ক্রুসেডারদের কাছ থেকে সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী আল আকসা (জেরুজালেম) জয় করার পর ক্রুসেডাররা পালিয়ে পার্শ্ববর্তী খ্রিষ্টান রাজ্য এন্টিওকে আশ্রয় নেয়। ভেবেছিল সেই রাজ্যের খ্রিষ্টান শাসক তাদের দেখভাল করবেন। এন্টিওকের রাজ্যপ্রধান জানতে পারলেন যে, এরা যুদ্ধে হেরে পালিয়ে এসে আশ্রয় চাইছে। সাহায্য করা তো পরের কথা, তাদের সম্পদ পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে বের করে দেওয়া হয় রাজ্য থেকে। অথচ সেখানে ছিল অভুক্ত নারী-শিশুরাও।

তারা সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর কাছে ফিরে এসে পুরো ঘটনা বর্ণনা করে। তখন সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী (রহিমাহুল্লাহ) তাদেরকে আশ্রয় দান করেন, দেখভাল করেন এবং খাদ্যের জোগান দেন। একজন পশ্চিমা ইতিহাসবিদ বলেন,

> **"সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীকে তখনকার সময়ে পৃথিবীর সবচেয়ে মহান হৃদয়বান এবং সাহসী যুদ্ধজয়ী বলার জন্য শুধুমাত্র জেরুজালেম বিজয়ের ঘটনাই যথেষ্ট।"**

একজন কাফিরের মুখে এই স্বীকৃতিই আইয়ুবীর মহানুভবতার প্রমাণ বহন করে।

একবার এক যুদ্ধের পর ভিড়ের মাঝে ছোটাছুটি করে কান্না করছিল একজন খ্রিষ্টান মহিলা। জানা গেল যে, তার মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে। এই খবর সালাহ উদ্দীনের কাছে পৌঁছালে তিনি সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেন সেই মেয়েকে খুঁজে আনতে। খোঁজ নিয়ে দেখা যায় তার মেয়েকে একজন মুসলিমের কাছে দাসী হিসেবে বিক্রি করে দিয়েছে কেউ। তখন সালাহ উদ্দীন নিজ অর্থ দিয়ে মেয়েটিকে তার মালিকের কাছ থেকে কিনে নিয়ে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন। হাসি ফোটে সেই মায়ের মুখে।

প্রতিবার যুদ্ধ জয়ের পরেই তিনি ক্রুসেডারদের শহর ত্যাগের সময় মুসলিমদের মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা দান করতেন। জেরুজালেম জয়ের পরেও সেখানকার খ্রিষ্টানদের

জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন তিনি। এমনকি তাঁর প্রধান শত্রু ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড দ্যা লায়নহার্ট অসুস্থ হয়ে পড়ার পর ফলমূলও প্রেরণ করেছিলেন।

আল কুদস জয়ের পর তার সীমানা প্রাচীর নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহন করেন সালাহ উদ্দীন। নিজের কাঁধে দঁড়ি বহন করে শ্রমিকদের সাথে তৈরী করেন আল কুদসের সীমানা।

জ্ঞানপিপাসা

সালাহ উদ্দীন (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন অত্যন্ত সুশিক্ষিত এবং পরিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী একজন ব্যক্তি। কারও কাছ থেকে কোনো হাদীস শুনলে উক্ত হাদীসের সনদসহ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা জানতে চাইতেন। আসলে শুধু হাদীস নয়, যেকোনো সংবাদ গ্রহণের ক্ষেত্রেই একই ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সমাজে যত মিথ্যা অপবাদ ও অন্যায় দোষারোপ, সবকিছুর মূলে আছে যাচাইবিহীন সংবাদ গ্রহণ।

আরবদের বংশবৃত্তান্ত, জীবনী, আরবের ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে ভালো জানাশোনা ছিল তাঁর। এমনকি আরব ঘোড়ার প্রজাতি ও বংশধারা সম্পর্কেও তিনি অবগত ছিলেন। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের আশ্চর্যজনক প্রাণী ও ঘটনা সম্পর্কে জানতেন খুব আগ্রহভরে।

নিয়ত ঠিক থাকলে এগুলোও কোনো অসার জ্ঞান নয়। আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট যাবতীয় সৃষ্টির রহস্য জানার আগ্রহের ফলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরী হয়। এসব জ্ঞান কেবল আল্লাহকে জানার জন্যই অর্জন করতেন সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী।

ধনবান কৃচ্ছ্রসাধক

দুনিয়ার প্রতি সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর (রহিমাহুল্লাহ) যে মনোভাব ছিল, তাকে আরবিতে বলা হয় যুহদ। যুহদ শব্দের উপযুক্ত অর্থ হলো দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ততা বা নিরাসক্তি। অনেকে মনে করে দরিদ্র না হলে যুহদ থাকা সম্ভব না। এটি যুহদের সঠিক অর্থ নয়।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে (রহিমাহুল্লাহ) একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, “১০

লক্ষ দিনারের মালিকের পক্ষে কি যুহদ অর্জন করা সম্ভব?" তখন ইমাম আহমদ বলেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই। যদি তার এই অর্থের বৃদ্ধিতে সে খুব বেশি উৎফুল্ল না হয় এবং অর্থের হ্রাসে কষ্ট না পায়, তবে বলা যাবে সে যুহদ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আবার খুব সামান্য অর্থের মালিক যদি ধনবৃদ্ধিতে উৎফুল্ল হয় কিংবা সামান্য অর্থহ্রাসে অসন্তোষ প্রকাশ করে, তবে সে যুহদ অর্জন করতে পারেনি।" সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকার নামই যুহদ।

দামেস্কে একবার কিছু ব্যক্তি সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর জন্য অসম্ভব সুন্দর একটি বাড়ি নির্মাণ করে দেন। তিনি বাড়িটি দেখে জানালেন যে, তিনি এতে থাকতে চান না। তারা তো অবাক! কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, আমাদেরকে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে। এ ধরনের বাড়ি মরণশীল মানুষকে জীবনের এ উদ্দেশ্য থেকে বিমুখ করে দিতে পারে।

সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে, "আমার চোখে যাহাব (স্বর্ণ) এবং তুরাব (ধুলো) দুটোই সমান।" কারণ একদিন আমরা মৃত্যুবরণ করে ধুলোয় পরিণত হব। স্বর্ণ-ধুলো কোনো কিছুরই মূল্য থাকবে না সেদিন। আমাদের আসল ঠিকানা আখিরাত। সেখানে কাজে লাগবে দুনিয়ার নেক আমল, সোনাদানা নয়।

রাজা হয়েও তিনি কখনো ইসলামের বিধিনিষেধ অতিক্রম করেননি। যেমন মহানবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরুষদেরকে স্বর্ণ এবং রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, যারা দুনিয়াতে রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ পরিধান করবে, তারা আখিরাতে এসব পরিধানের সুযোগ পাবে না। অথচ অতীত-বর্তমানের অসংখ্য মুসলিম শাসক অমান্য করেন এ নির্দেশ। কিন্তু সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি সবসময় সাধারণ সুতা এবং লিনেনের তৈরি ইসলাম অনুমোদিত বস্ত্র পরতেন। এছাড়া তিনি বিনোদনের জন্য বা অযথা জনসমাগমে যেতেন না কখনোই। গানের মজলিস, কথকের মজলিস তো দূরের কথা।

দানশীলতা

সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী (রহিমাহুল্লাহ) অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। বিশ্বাস করতেন যে, ইসলামের একজন যোদ্ধা হিসেবে তাঁকে সর্বদাই ময়দানে থাকতে হবে। কোনো একদিন সেখান থেকে আর ফিরে আসা হবে না। তাই সম্পদ জমিয়ে রাখার কোনো মানে নেই। নিজের বস্ত্র থেকে শুরু করে ঘোড়া পর্যন্ত দান করতেন তিনি। এমনকি একসাথে ১০ হাজার ঘোড়া দান করার ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে তাঁর ব্যাপারে।

সাধারণত রাজা-বাদশাহদের মৃত্যুর পরে তাদের অগাধ ধন সম্পদ পাওয়া যেত। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের বাইরেও তাদের থাকত ব্যক্তিগত কোষাগার। এমনকি ধন সম্পদের জন্যই মেরে ফেলা হতো অনেক রাজাকে।

কিন্তু সালাহ উদ্দীন অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে এতটাই স্বচ্ছ ছিলেন যে, নিজস্ব কোনো কোষাগার ছিল না তাঁর। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগার বায়তুল মালেই রাখতেন নিজের অর্থ। মৃত্যুর পর তাঁর যাকাত দেয়ার মতোও সম্পদ ছিল না। ৪৭ টি রৌপ্যমুদ্রা এবং একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল কেবল। সিয়ারু আলামিন নুবালায় ইমাম আয যাহবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এ ধরনের দৃষ্টান্ত নবি রাসূলদের মধ্যে দেখা যেতো। মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর ব্যবহার্য কিছু সামগ্রী এবং পোশাক ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি।[৬৭]

ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর জন্য সবসময় সমানভাবে অর্থ ব্যয় করতেন তিনি, সে রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হোক বা সবল।

মুসলিম ভূমির মুক্তিদূত

আল-আকসা সহ মুসলিম রাজ্যগুলো যতদিন অমুসলিমদের অধীনে ছিল, ততদিন সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী কোনো কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করেননি। খাদ্যসামগ্রী, পোশাক পরিচ্ছদ, ধনসম্পদ কোনো কিছুতেই না। ঠিক যেমন কারো নিকটাত্মীয়, বন্ধু, প্রেমাস্পদ মৃত্যুবরণ করলে পৃথিবীর কোনোকিছুতেই আনন্দ পাওয়া যায় না, তেমনই।

[৬৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা

জাফর ইবনু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) শহীদ হওয়ার পরে নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর একজন সাহাবিকে বলেছিলেন তার পরিবারের জন্য খাদ্য এনে দিতে। সেই থেকে কোনো মুসলিম মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারের জন্য খাদ্য নিয়ে যাওয়া ইসলামের নিয়ম। কারণ, মৃতের বাড়িতে রান্নাবান্নার মতো মানসিক অবস্থা কারও থাকে না।

মুসলিম ভূমিগুলোর পরাধীনতার ব্যাপারে সালাহ উদ্দীনের অস্থিরতাও ছিল এ পর্যায়ের।

ইমাম আয যাহাবি (রহিমাহুল্লাহ) সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী সম্পর্কে বলেন,

> "তাঁর মতো জিহাদ প্রতিষ্ঠায় তীব্র প্রতিজ্ঞা এবং শত্রুকে বিশ্লেষণ ক্ষমতা সমসাময়িক এবং তাঁর আগে ও পরে কারোর মধ্যেই ছিল বলে শোনা যায়নি।"[৬৮]

ইন্তিকাল

সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর (২৭ সফর ৫৮৯ হিজরী) ৫৫ বছর বয়সে দামেশকে ইন্তিকাল করেন। সময়টি ছিল ফজরের পর। জাফর আল কুরতুবী বলেন- মৃত্যুর আগে তিনি সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তিলাওয়াত করে সুলতানকে শুনাচ্ছিলেন। আর প্রতিটা আয়াতের পর সুলতান বলছিলেন, "হ্যাঁ, সত্য। আল্লাহ এমনটিই বলেছেন।"

অথচ মৃত্যুর আগে তাঁর মস্তিষ্ক ঠিকভাবে কাজ করছিল না। কিন্তু যেই না কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত শুনলেন, সাথে সাথে সচল হয়ে গেল মস্তিষ্ক।

দামেশকের আস-সাফফায় দাফন করা হয় তাঁকে। তাঁর ইন্তিকালে দামেশকের লোকজন রাস্তায় বের হয়ে টানা কয়েকদিন শোক প্রকাশ করেছিল। এমনকি তাঁর ইউরোপীয়ান শত্রুরা পর্যন্ত বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিল তাঁর মৃত্যুসংবাদে। কারণ তিনি তাদের সাথে কৃত প্রতিটি চুক্তি রক্ষা করতেন। কোনো ওয়াদা ভঙ্গ করতেন না। অথচ আজকাল সাধারণ মুসলিমরাও নিজেদের কথা দিয়ে কথা রাখে না। শাসকদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

---

[৬৮] সিয়াক আলামিন নবালা

কবি আশ শাতানী সালাহুদ্দীন আইউবী সম্পর্কে লিখেছেন-

أرى النصر معقوداً برايتك الصفرا ... فَسِر واملُك الدنيا فانت بها أحرى

"আমি দেখেছি বিজয় তোমার সাথে আসছে। তোমার হলুদ পতাকা দুলিয়ে-
যাও, জয় করে এসো বিশ্বজোড়া। তুমিই এর যথাযথ হকদার।"

লোকে বলে, আজ যদি সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর মতো কেউ থাকত, তাহলে আমরা আবারও জেরুজালেমকে স্বাধীন করতে পারতাম। কিন্তু বর্তমান সময়ে সালাহ উদ্দীনের মতো কেউ থাকলে সত্যি বলতে কেউই তাঁর কথা মেনে নিত না, তাঁকে অনুসরণ করত না। আর এ জন্যই সালাহ উদ্দীনের মতো কেউ জন্মায় না বর্তমান সময়ে। আল্লাহ তাআলা তখনই সালাহ্ উদ্দীনের মতো মানুষকে প্রেরণ করবেন, যখন তাঁর পেছনে থেকে তাঁর নির্দেশনা নির্দ্বিধায় মেনে চলার মতো মুসলিম থাকবে।

আল্লাহ তাআলা এই মহান সুলতানের প্রতি রহম করুন। আমাদের মধ্য থেকেই আরও একজন সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবী তৈরি করে দিন, যার হাত ধরে আবারও উদ্ধার হবে আমাদের আকসা।

মঙ্গোল-বিনাশী বীর

সুলতান মুযাফফর সাইফ উদ্দীন কুতুয রহিমাহুল্লাহ

এক বৈশ্বিক মহামারীর উত্থান

সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী জেরুজালেমকে ক্রুসেডারদের কবল থেকে পুনরুদ্ধার করার ২০ বছর আগে মঙ্গোলিয়ায় এক ভয়ানক মানুষের জন্ম হয়। তার নাম তেমুজিন। মঙ্গোলিয়া তখন বিচ্ছিন্ন ও শত্রুভাবাপন্ন অনেকগুলো যাযাবর গোত্রে বিভক্ত। তেমুজিনের বাবা একজন গোত্রপতি। নিহত হন প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক গোত্রের হাতে। তেমুজিনকে আর নেতা হিসেবে মেনে নেয়নি তার জাতি।

প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শৈশব কাটিয়ে নানা ঘটনাপ্রবাহে একসময় শক্তিধর এক শাসকে পরিণত হয় তেমুজিন। ঐক্যবদ্ধ করে ফেলে পুরো মঙ্গোলিয়া। মঙ্গোল সাম্রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে। আর তেমুজিন ধারণ করে নতুন উপাধি চেঙ্গিস খান।

অতীত জীবনের দুঃসহ স্মৃতি চেঙ্গিস খানকে পরিণত করে এক রক্তপিপাসু রাজায়। খোদ মঙ্গোল রাজ্যে মেধাতন্ত্র, সহনশীলতা, ও ঐক্যের চর্চা করলেও এর বাইরের অঞ্চলগুলোর ওপর চেঙ্গিসের নীতি ছিল একেবারে বিপরীত। তারই হাতে রচিত হয় বিশ্ব-ইতিহাসের বর্বরতম সম্প্রসারণবাদী সাম্রাজ্যের ইতিহাস। বিভিন্ন সূত্রমতে, মঙ্গোল আগ্রাসনে নিহত বেসামরিক মানুষের মোট সংখ্যা চার থেকে ছয় কোটি। চেঙ্গিসের মৃত্যুর পর তার বংশধররাও বর্বরতার এ ধারা অব্যাহত রাখে একাধিক প্রজন্ম জুড়ে।

মুসলিম বিশ্বের হালচাল

তখন মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক অবস্থা অনেকটা এখনকার মতোই ছিল। চরমে পৌঁছে গিয়েছিল ভেদাভেদ ও অনৈক্যের মাত্রা। মুসলিম জাহানের শাসন বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। যেমন, ইরান এবং খোরাসানের শাসন ছিল খাওয়ারিজিমীদের হাতে। সিন্ধু, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান পরিচালনা করতো ঘুরীরা। শাম, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের কর্তৃত্বে ছিল আইয়ুবীরা। ইরাকের হুকুমত আব্বাসি খলীফাদের নিয়ন্ত্রণে এবং তুর্কমেনিস্থান ও জর্জিয়া ছিল সেলজুকদের অধীনে। আর ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বিকৃত সুফীবাদের মধ্য দিয়ে বিদআতের সয়লাব তো ছিলই।

মহামারীর আঘাত

এদিকে মঙ্গোলরা ১২১৬ সালের মধ্যে কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, চীন এবং তিব্বত জয় করে ফেলে। এরপর তাদের নজর পড়ে মুসলিমদের ভূমির ওপর। ১২১৯ সালের মধ্যে খাওয়ারিজিমীরা ইরানে এবং খোরাসানে পরাজিত হয়। ১২৩১ থেকে ১২৪২ পর্যন্ত আফগানিস্তান, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া সহ বিশাল ভূমি দখল করে নেয় মঙ্গোলরা। মুসলিমদের প্রবলভাবে মঙ্গোলভীতি পেয়ে বসে। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, জানে বাঁচার জন্য দেশের দখল ছেড়ে দিচ্ছে শাসকবর্গ। জিহাদের কথা কেউ চিন্তাও করেনি তখন।

মঙ্গোলদের নেতৃত্বে তখন চেঙ্গিসের নাতি হালাকু খান। এবারে খিলাফাতের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ গুঁড়িয়ে দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করে তারা। ইরাক এবং বাগদাদের ক্ষমতা ছিল আব্বাসীয়দের হাতে। আব্বাসি খিলাফাহ তখন মৃতপ্রায়। খলীফাদের ঝোঁক যতটা না খিলাফাহ সুরক্ষার দিকে, তার চেয়ে বেশি ছিল নাচ, গান, আর বিনোদনের দিকে।

খলীফা মুস্তাসিমের উপদেষ্টা ছিল ইবনু আলকামী নামের একজন শিয়া। তার সাথে ছিল হালাকু খানের আঁতাত। হালাকুর কথামতো সে খলীফাকে ভুল পরামর্শ দিতো। হালাকু খান বাগদাদ অবরোধ করলে ইবনু আলকামী হালাকু খানকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য খলীফাকে সৈন্যহ্রাস করার পরামর্শ দেয়। মুস্তাসিমও মেনে নেয় তার

কথা।

ইরাকের মুসলের সেনা প্রধান ছিলেন বদরুদ্দিন। কিছু পণ্যক্রয়ের আবেদন জানিয়ে হালাকু খান ও মুস্তাসিম একই সময়ে দুটি চিঠি পাঠায় তার কাছে। হালাকু চেয়েছিল কিছু সিজ মেশিন, শহরের প্রতিরক্ষা-দেয়াল ভাঙার যুদ্ধাস্ত্র। আর মুস্তাসিম চেয়েছে নর্তকী-গায়িকাদের জন্য কিছু ভালো মানের সেতার। বদরুদ্দিন তা দেখে আফসোসে কপাল চাপড়ান।

বাগদাদের পরিণতি

বাগদাদ ছিল মুসলিম সভ্যতার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। দশ লাখেরও বেশি মানুষের বসবাস ছিল সেখানে। তা সত্ত্বেও শেষ পর্যায়ে তা কমে আসে মাত্র দশ হাজারে। তাদের মধ্যেও কতক মাসজিদে বসে যিকর ও নফল আমলে ব্যস্ত ছিল। বড় জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে হালাকুর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য দুআ করে চলছিল কেবল। আর কতক মুনাফিক দুআ করছিল যেন মঙ্গোল সৈনিকরা জয়ী হতে পারে।

ওদিকে মুস্তাসিমের সৈন্য এবং মুস্তাসিম নিজে নর্তকী এবং গায়িকাদের সাথে মশগুল। মঙ্গোলিয়ানরা যখন পুরো শহর ঘিরে ফেলে, তখন গাদ্দার উজির ইবনু আলকামি খলীফা মুস্তাসিমকে বলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হার মেনে নিয়ে শহর ছেড়ে চলে যেতে। মুস্তাসিম রাজি হয়ে যায়। রাজকুমারী, সৈন্য, মন্ত্রী মিলিয়ে ৭০০ মানুষ সহ হালাকু খানের সাথে দেখা করতে যায় সে। কিন্তু হালাকু ১৭ জনকে ছাড়া তাদের সবাইকে হত্যা করে।

হালাকু মুস্তাসিমকে বলে তাকে বাগদাদের সকল রত্ন দিয়ে দিতে। মুস্তাসিম তার সোনা রূপা অলংকার হীরা সবই দিয়ে দেয় হালাকুকে। কিন্তু হালাকু সন্তুষ্ট না হয়ে বলে, “আমি এখানে অতিথি, তাই আমার প্রাপ্য এর চেয়েও বেশি কিছু।” এ কথা শুনে মুস্তাসিম কাঁপতে কাঁপতে তার সৈনিকদেরকে বাগদাদের কোষাগার হালাকুর জন্য খুলে দিতে বলে। প্রচুর স্বর্ণ এবং রত্ন জমা ছিল সেখানে। কিন্তু হালাকু তাতেও সন্তুষ্ট না।

মুস্তাসিম শেষ পর্যন্ত তার সৈনিকদেরকে রাজ প্রাসাদের মাটি খুঁড়ে ফেলতে আদেশ দেয়। অনেক গভীর পর্যন্ত খোঁড়ার পর দেখা গেল একটা পুকুরের মতো খনন করা

জায়গায় হাজার হাজার ইট পড়ে আছে। কিন্তু প্রত্যেকটা ইটে বাঁধা রয়েছে স্বর্ণ, হীরক, রূপা, ইত্যাদি। শতভাগ শুদ্ধ স্বর্ণ ছিল সেই গর্তের মধ্যে। হালাকু কিছু স্বর্ণ তুলে মুস্তাসিমকে বলল, "এগুলো চিবিয়ে খাও।" কিছুক্ষণ মুস্তাসিমকে ব্যর্থ চেষ্টা করতে দেখার পর বলে, "যদি খেতেই না পারো, তবে এগুলো জমা করে লুকিয়ে রেখেছ কেন? সৈন্যদের পেছনে খরচ করতে পারলে না? করলে তো বাগদাদকে বাঁচাতে পারতে!"

হালাকুর সৈন্যদল খলীফাকে একটি বস্তায় ভরে হাতির পায়ের নিচে পিষিয়ে হত্যা করে। তারপর বাগদাদে বয়ে যায় রোজ কিয়ামাতের বিভীষিকা। অনিন্দ্য সুন্দর শহরটি দাঁড়িয়ে রইল ধ্বংসের সাক্ষী হয়ে।

মঙ্গোলরা এতই ভয়ংকর ছিল যে, বাগদাদের মানুষ মনে করেছিল এরাই ইয়াজুজ-মাজুজ। যেখানে যাকে পেয়েছে—নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু—সবাইকে মেরে ফেলেছে তারা। কাউকে ছাড় দেয়নি। মানুষজন তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য যেখানে পারে লুকিয়েছে। মাসজিদ থেকে শুরু করে নালা, কূপ, শৌচালয় এমনকি কবর খনন করেও লুকিয়েছিল। তবু হয়নি শেষ রক্ষা। তাদের রক্তে নদী নালা ভেসে গেছে।

একটা বিখ্যাত ঘটনা আছে। মাসজিদে কোনো মুসলিমকে দেখে একজন মঙ্গোল নারী সাথে সাথে তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। কিন্তু নিজের তলোয়ার আনতে ভুলে গিয়েছিল সে। তাকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে তলোয়ার আনতে যায় সে। আর মুসলিম লোকটাও অপেক্ষাও করে! এতটাই ভীত হয়ে পড়েছিল তারা।

বাগদাদের সকল লাইব্রেরী ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পৃথিবী বঞ্চিত হয় সুবিশাল এক জ্ঞানভাণ্ডার থেকে। কারণ তখন বাগদাদ ছিল মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানকেন্দ্র। নদীতে শুধু রক্তই বইতো না তখন, ছেঁড়া বই এবং কলমের কালী বয়ে কালো হয়ে যায় নদী।

সেদিন আটলক্ষ মুসলিমকে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল বাগদাদে! পঁচা লাশ আর রক্তের দুর্গন্ধে হালাকু নিজেই বাগদাদ ছেড়ে চলে যায়। এরও ৪০ দিন পর বেরিয়ে আসে নানা জায়গায় লুকিয়ে থাকা মানুষগুলো। কিন্তু বেরিয়ে এসেও কেউ কারো সাথে কথা বলেনি। এমনকি পুত্র তার পিতার সাথে সালাম আদান প্রদানও করেনি। কারণ যদি কোনো গুপ্তচর জানতে পারে যে তারা মুসলিম, তাহলে তাদেরকে মেরে ফেলা হবে।

মাত্র ৪০ দিনে ৫০০ বছরের মুসলিম সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায় মঙ্গোলীয়দের হাতে।

মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় তখনও চলছিল ক্রুসেড। বাগদাদের পতনে খ্রিষ্টানদের আনন্দ আর দেখে কে!

দ্বীন থেকে সরে গিয়ে ধন-সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ব্যস্ত মুসলিমদের জন্য এই পরিণতি নির্ধারিতই ছিল। মহানবি (সাঃ) বলেছেন,

اذ ضن الناس بالدينار والدرهم ، وتبايعوا بالعينة ، واتبعوا أذناب البقر ، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء ، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينه

"যখন মানুষ দিনার ও দিরহামের গোলামি শুরু করবে, ব্যবসায় লিপ্ত হবে, গরুর লেজের পেছনে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা চাপিয়ে দেবেন, যতক্ষণ না তারা পুনরায় দ্বীনে ফিরে আসে।"[৬৯]

পরবর্তী লক্ষ্য

বাগদাদ দখল করেই হালাকু সন্তুষ্ট হয়নি। তারপর সে ফিলিস্তিন ও সিরিয়াও অধীনস্থ করে। বাগদাদের ঘটনায় স্তম্ভিত কিছু মুসলিম সেনাপ্রধান এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তি নিজেদের ক্ষমতা থেকে সরে গিয়ে পালাতে শুরু করে। ততদিনে কেবলমাত্র মিশর ছাড়া বাকিসব মুসলিম সাম্রাজ্য মঙ্গোলীয়দের পদানত। তাই মিশর পরিনত হয় বিভিন্ন দেশ থেকে পলাতক মুসলিমদের আশ্রয়ভূমিতে।

তখন মিশরের ক্ষমতা মামলুকদের হাতে। আইয়ুবীদের পরেই মিশরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন মামলুকরা। এরা মূলত চেচনিয়া থেকে দাস হিসেবে আমদানীকৃত। কালক্রমে এই ক্রীতদাস জাতি হয়ে যায় মিশরের সুলতান।

এদিকে হালাকুর পরবর্তী পরিকল্পনাই ছিল মিশরকে পদানত করা। কারণ, তখনকার সময়ে মিশর জয় করার অর্থ সমগ্র উত্তর আফ্রিকা বিজয়। আর উত্তর আফ্রিকা থেকে জিব্রাল্টার হয়ে একবার স্পেনে ঢোকার মানে হলো পশ্চিম ইউরোপকে পদানত করা। সেটি করতে পারলেই পূর্ণ হবে পিতামহ চেঙ্গিসের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন। মঙ্গোলদের বিশ্ব জয়ের স্বপ্নে তখন একমাত্র বাধা ছিলেন—মিশরের মামলুক সুলতান মুযাফফর

[৬৯] আবূ দাউদ, মুসনাদে আহমদ

পালটা জবাব

কুতুয ছিলেন একজন সাহসী, নির্ভীক যোদ্ধা। ভয় কী জিনিস, জানতেন না তিনি। তার প্রধান সেনাপতি বাইবার্স ছিলেন তার চেয়েও সাহসী। মুযাফফর কুতুয তাঁর সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে শুরু করেন। এমনকি বিভিন্ন দেশ থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেওয়া মুসলিমদেরকেও দেন যুদ্ধের প্রশিক্ষণ।

এমনসময় হালাকু মুযাফফর কুতুযের কাছে একটি চিঠি পাঠায়। চিঠিতে সে লিখে–

আমাদের তরবারির ভয়ে পালিয়ে যাওয়া মিশরের মামলুক সুলতান কুতুযের প্রতি পূর্ব ও পশ্চিমের সকল রাজার রাজাধিরাজ বিশ্ব অধিপতি খানের ফরমান–

তুমি কোথায় লুকাবে? কোন রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যাবে? আমাদের ঘোড়াগুলো যেমন তেজী, শরগুলোও তেমন তীক্ষ্ণ। আমাদের তরবারি বজ্রের মতো আর হৃদয় পর্বতের মতো শক্ত। মরু বালুকার মতো আমাদের সৈন্যসংখ্যাও গুণে শেষ করা যাবে না। না কোনো দুর্গ আমাদের আটকাতে পারবে, না কোনো সৈন্যদল পারবে আমাদের রুখতে। আল্লাহর কাছে তোমাদের ফরিয়াদ আমাদের বিরুদ্ধে কোনো কাজেই আসবে না। কোনো শোকের মাতম আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারবে না, না চোখের অশ্রু গলাতে পারবে আমাদের মন। শুধু যারা প্রাণ ভিক্ষা চাইবে, তারাই আমাদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে। যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়ার আগেই তোমার উত্তর পাঠিয়ে দিও। কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে তার ফল হবে ভয়ংকরতম। আমরা তোমাদের মাসজিদগুলো ভেঙে চুরমার করে ফেলব আর তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দুর্বলতা প্রকাশ করে দেবো সবার সমানে। তারপর তোমাদের শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করব। মনে রেখ, এই মুহূর্তে কেবল তোমরাই আমদের একমাত্র শত্রু।[৭০]

ইতোপূর্বে যারা বিনাযুদ্ধে মঙ্গোলদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তাঁদের করুণ পরিণতি সাইফউদ্দীন কুতুয ভালোভাবেই জানতেন। তাই বিনাযুদ্ধে অপমানের মৃত্যুর

[৭০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

চেয়ে তিনি চাইলেন এই বর্বর বাহিনীর মুখোমুখি হতে। ওপরে উল্লেখ করা চিঠির উত্তরটা সুলতান কুতুয দিয়েছিলেন মঙ্গোল দূতের শিরোশ্ছেদ করে। এর ফলাফল সকলের কাছেই অনুমেয়। যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল দুপক্ষের জন্য।

যুদ্ধপ্রস্তুতি

যুদ্ধকে সামনে রেখে একটি কাউন্সিল গঠন করেন কুতুয। সেখানে অনেকের মাঝে ছিলেন বিখ্যাত আলিম আল ইয বিন আবদুস সালাম আশ শাফিয়ী। একইরকম নির্ভীক। মুযাফফর কুতুয ক্ষমতায় আসার পূর্বে মিশরের রাজা ছিল ইসমাইল ইবনু আদিল। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে নিজের ভাইদের বিরুদ্ধেই ক্রুসেডারদের সৈন্যর দিত সে। আর্থিক সহায়তা থেকে শুরু করে তাদেরকে অস্ত্র কেনার অনুমতিও দিয়ে রেখেছিল। একটাই শর্ত। ভাইদের দিক থেকে কোনো সমস্যা হলে যেন ক্রুসেডাররা তার সাহায্যে শামে আসে।

তখন আল ইয ইবনু আবদুস সালাম ছিলেন মিশরের শিক্ষা ও আইন মন্ত্রণালয়ের প্রধান এবং উমাইয়াদের ইমাম। তখন তিনি ক্রুসেডারদের কাছে যেকোনো ধরনের অস্ত্র বিক্রয় করা হারাম মর্মে একটি ফতোয়া জারি করেন। জুমার খুতবায় তখনকার সুলতান ইসমাইলের নাম উচ্চারণ করে দুআও করেননি তিনি। তখনকার সময়ে দুআ না করার অর্থই হলো বাইয়াত না দেওয়া। যার ফলে তাকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। অনেকেই তার কাছে এসে অনুরোধ করে সুলতানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে। কিন্তু তিনি বলেন,

قرئت العلم لاكون سفيرة بين الله وبين العباد واتردد عن هؤلاء والله ما أرضاه أن يقبّل يدي، فضلاً عن أن أقبّل يده. يا قوم أنتم في واد، وأنا في واد، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به

"আমি ইলম শিখেছি আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করিয়ে দেওয়ার জন্য। আর আমি এই সমস্ত লোককে প্রত্যাখান করি। মহান আল্লাহর শপথ! আমি চাই না এই সুলতান আমার হাত ধরুক। আমি তার হাত ধরা তো দূরের কথা! আর লোকসকল! তোমরাও এই ভূমিতে আছ এবং আমিও আছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যিনি আমাকে তোমাদের পরীক্ষিত বস্তু থেকে

রক্ষা করেছেন।”

মুযাফফর কুতুযের শাসনামলে এই আলিম তাঁর প্রাপ্য পার্থিব সম্মানও ফিরে পান। মুযাফফর কুতুয চাইছিলেন যুদ্ধের প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে সাধারণ মানুষের কর বৃদ্ধি করতে। আল ইয ইবনু আব্দুস সালাম বলেন, “আগে আপনি এবং আপনার লোকজন নিজেদের গুপ্তধন থেকে স্বর্ণ এবং মূল্যবান সামগ্রী দান করুন। সেখান থেকে না পোষালে পরে কর বৃদ্ধির অনুমতি দেবো।”

এদিকে সিরিয়া এবং অন্যান্য দেশ থেকে পালিয়ে আসা মুসলিমরা বুঝতে পারলো এটাই শেষ। এখান থেকে পালানোর আর সুযোগ নেই। তাই যুদ্ধের ময়দানে নেমে যুদ্ধ করাই শ্রেয়। তারপরও মিশরের কিছু কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি সম্পদ নিয়ে পালিয়ে যায়। মুযাফফর কুতুয বাধা দেননি তাদেরকে। তারপর মুযাফফর এবং তার সৈন্যরা জিহাদের পরিকল্পনা শুরু করেন।

দুর্ধর্ষ মঙ্গোল বাহিনীর মূল শক্তি ছিল তাদের ক্ষিপ্র এবং দ্রুতগামী ঘোড়া। এছাড়া ঘোড়ার উপর থেকে তির ছুড়ে মারার বিশেষ দক্ষতা ছিল তাদের, যা ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য সেনাবাহিনীর ছিল না। মঙ্গোল ধনুকগুলো ছিল হালকা কিন্তু অসম্ভব শক্তিশালী। পাল্লা বেশি হওয়ায় ঘোড়ার ওপর চড়েও ব্যবহার করা যেত ধনুকগুলো।

মঙ্গোলদের আরেকটি কৌশল ছিল পরপর অনেকগুলো সারিতে বিন্যস্ত না হয়েই যতটা সম্ভব পাশাপাশি দাড়িয়ে হামলা চালানো, যাতে সুযোগ বুঝে শত্রু বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা যায়। সুলতান কুতুয বুঝতে পারলেন, চওড়া প্রান্তরে মঙ্গোলদের মুখোমুখি হওয়া মানে সাক্ষাৎ ধ্বংস ডেকে আনা। তিনি মঙ্গোলদের যুদ্ধক্ষেত্র বেছে নেওয়ার সুযোগই দিলেন না। নিজেই সৈন্য নিয়ে এগিয়ে গেলেন তাদের মোকাবেলা করার জন্য। বেছে নিলেন ফিলিস্তিনের তাবারিয়ার আইন জালুত প্রান্তর।

মুখোমুখি সংঘর্ষ

মুযাফফর কুতুযের পরিকল্পনা মোতাবেক দুই দলই আইন জালুতে মিলিত হয়। এটি বেশ সংকীর্ণ একটি উপত্যকা। ফলে মঙ্গোলীয়দের বিশাল বাহিনী মানিয়ে নিতে পারছিল না। আইন জালুতের একপাশে জিলবাওয়া পর্বত এবং অন্য পাশে জালুত

নদী। কুতুয প্রথমে ছোট একটি দল পাঠিয়ে মঙ্গোলদের প্ররোচিত করলেন আগে হামলা করার। শুধু তা-ই নয়। তিনি জানতেন তাঁর সিরীয় সৈন্যরা আগেও একবার মঙ্গোলদের কাছে হেরে পালিয়ে এসেছে। তাই বিপদে পড়লে এরা আবারও পালাবে। তারা যাতে পালাতে না পারে, সেজন্য তিনি এদের রাখলেন সবার সামনে।

১২৬০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর (৬৫৮ হিঃ,২৫ রমজান) গাযার কাছে আইন জালুতে উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়। সে যুদ্ধে মঙ্গোলদের সেনাপতি কিতাবুকা। উভয় পক্ষেই ছিল প্রায় ২০০০০ মত সৈনিক। এ এলাকা সম্পর্কে মামলুকদের ভালো জ্ঞান ছিল। তাই সুলতান কুতুয তাঁর অধিকাংশ সৈনিককে পার্বত্য এলাকায় লুকিয়ে রাখলেন। আর বাইবার্সকে অল্প কিছু সৈনিক দিয়ে মাঠে নামালেন মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধে। কয়েক ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষ হয়। বাইবার্স বাহিনীর কৌশল ছিল 'হিট অ্যান্ড রান'। উদ্দেশ্য নিজেদের যথাসম্ভব অক্ষত রেখে মঙ্গোলদের উস্কে দেওয়া। মঙ্গোলরা বড় আক্রমণ শুরু করলে বাইবার্স পিছু হটতে থাকেন।

শুরুতে মঙ্গোলদের প্রবল আক্রমণের মুখে কুতুযের সৈন্যদের অবস্থা ছিল টালমাটাল। তখন সুলতান নিজে শিরস্ত্রাণ খুলে উঁচু জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে সৈন্যদের সাহস যোগান আর নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়েন সাধারণ সৈন্যদের মাঝে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য।

বাইবার্স মঙ্গোলদের সেই পার্বত্য এলাকায় নিয়ে যেতে সক্ষম হন, যেখানে গাছ-পালা আর পাহাড়ের আড়ালে ওঁত পেতে ছিল মামলুক সৈন্যরা। বাইবার্স পুরো মঙ্গোল বাহিনীকে মামলুক সৈন্যদের অ্যাম্বুশের মাঝে নিয়ে আসেন। কিতাবুকা বাইবার্সের চাল বুঝতে পারেনি, তাই সে তার সৈন্যদের পলায়নপর বাইবার্সের পেছনে ছুটতে আদেশ দেয়। যেহেতু প্রান্তরটি সরু, তাই মঙ্গোলরা তাদের পুরনো সেই কৌশল ব্যবহার করতে পারল না। উপরন্তু সিরীয় সৈন্যদের ভেদ করে কুতুযের ব্যূহের ভেতরে প্রবেশ করার পর তারা মুখোমুখি হলো কুতুযের এলিট বাহিনীর। যখনই মঙ্গোলরা পার্বত্য এলাকার কাছে গিয়ে পৌঁছল, তখনই মামলুক সৈন্যরা তাদের সামনে আবির্ভূত হলো। তির ছোঁড়া শুরু করল মামলুক অশ্বারোহীরা।

এবার মঙ্গোলরা বুঝতে পারল যে, মামলুকরা চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। এদিকে সামনের সারির সিরীয় সৈন্যদের জন্য পিছিয়েও আসতে পারছিল না তারা। সাথে সাথে দুই পাশ থেকে মঙ্গোলদের উপর নেমে আসে তিরবৃষ্টি। এক

পর্যায়ে তাদের সেনাপতি কিতবুকা মারা যায়। তারপরই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে মঙ্গোল সেনাবাহিনী। বিক্ষিপ্ত হয়ে পালিয়ে যেতে থাকে দিগ্বিদিক। কুতুযের সৈন্যরা প্রায় ৬০০ কিলোমিটার তাড়িয়ে শেষ হানাদার সৈন্যটিকেও হত্যা করে।

এভাবেই মামলুক সৈন্যদের কাছে পরাজয় ঘটে অহংকারী, বর্বর ও যালিম হালাকু বাহিনীর। নিমিষেই চূর্ণ হয়ে যায় তাঁদের আকাশছোঁয়া দম্ভ।

আইন জালুতের শিক্ষা

সেদিন যদি মুযাফফর কুতুয যুদ্ধে নামার সিদ্ধান্ত না নিতেন এবং অন্যান্য শাসকদের মতো পালিয়ে যেতেন, তাহলে হয়তো ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হতো পৃথিবী থেকে। তিব্বত থেকে শুরু করে মঙ্গোলিয়া, আফগানিস্তান, খুরাসান, ইরাক, ইরান, ফিলিস্তিন, মিশর কোথাও ইসলাম অবশিষ্ট থাকতো না হয়তো। মঙ্গোলরা অপরাজেয় বলে যে কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল, আইন জালুতের ঐতিহাসিক প্রান্তরে তার অবসান হয়। তাদের ভয়ে স্বদেশ থেকে পালিয়ে যেতে থাকা হাজার হাজার মানুষ একে একে ফিরে আসতে শুরু করে।

এই পরাজয়ের পরও মঙ্গোলরা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। কিন্তু আর কখনই আগের মতো সেই মনোবল ফিরে পায়নি তারা। শুধু মধ্যপ্রাচ্যের নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোর মধ্যে একটি হলো আইন জালুতের যুদ্ধ। কেননা এই যুদ্ধে সুলতান কুতুয হেরে গেল উত্তর আফ্রিকা, স্পেন ও ইউরোপ পরিণত হতো বাগদাদ, সমরখন্দ ও বেইজিং এর মত বধ্যভুমিতে। আদৌ মানব সভ্যতার ঐ ক্ষত সেরে উঠত কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর কারও জানা নেই। তবে বর্বর মঙ্গোল বাহিনীকে রুখে দেওয়ার অনন্য কীর্তির প্রতিদান হিসেবে যে বিশ্ববাসী চিরকাল সুলতান সাইফউদ্দীন কুতুযকে মনে রাখবে, সেটা বলে দেওয়া যায় নিঃসন্দেহে।

মহান আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে এভাবেই ইসলামের বীর সেনানীদের মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে হিফাজত করেন।

আল্লাহ তাআলা সুলতান মুযাফফর সাইফুদ্দীন কুতুযের প্রতি রহম করুন। তাঁর ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন। তাঁকে জান্নাতের উচ্চমর্যাদা দান করুন। আমীন।

হাদীসে বর্ণিত বিজেতা

সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ (রহিমাহুল্লাহ)

পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিজয় হলো বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলের বিজয়। এই বিজয়ের নায়ক অটোম্যান সাম্রাজ্যের মহান সম্রাট সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ। তাঁকে সবাই 'আল ফাতিহ' বা মহান বিজেতা হিসেবে চেনে।

এই শহর বিজয়ের কথা মহানবি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসে এসেছে। যখন সাহাবায়ে কেরাম (রদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) একবার প্রশ্ন করলেন, "মুসলিমদের হাতে রোম ও কনস্ট্যান্টিনোপলের মধ্যে কোন শহরের পতন আগে হবে?" আল্লাহর রাসূল উত্তরে বলেছিলেন, "কনস্ট্যান্টিনোপল।" এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের (রহিমাহুল্লাহ) মুসনাদে আরেকটি হাদীস আছে,

لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش

"অবশ্যই তোমরা কুসতুনতিনিয়া জয় করবে। তার নেতা কতই না উত্তম হবে এবং তার সৈন্যরাও হবে কতই না উত্তম!"[৭১]

[৭১] মুসনাদু আহমদ।

দুর্জয় কনস্ট্যান্টিনোপল

হাদীসের এই ভবিষ্যদ্বাণীর মর্যাদা লাভ করতে সাহাবাদের শাসনামল থেকেই মুসলিম শাসকদের প্রত্যেকে কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করতে চেষ্টা করেছেন। চেয়েছেন সেই সৌভাগ্যবান সেনাবাহিনীর অংশ ও সৌভাগ্যবান সেনাপতি হতে।

কনস্ট্যান্টিনোপল ছিল তখনকার দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং একইসাথে প্রাচীন এক জাঁকজমকপূর্ণ শহর। এই শহর নির্মিত হয়েছিল ঈসা আলাইহিস সালামের যুগের পরপরই। ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট প্রথম কনস্ট্যান্টাইনের হাতে এই শহরের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপিত হয়। খ্রিষ্টান বিশ্বের দুই কেন্দ্রের পূর্বদিকেরটির নাম বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য। এরই রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল। এই শহরের নান্দনিক অবকাঠামো নির্মাণ করেছিলেন তৎকালীন সময়ের সেরা গ্রীক প্রকৌশলীবৃন্দ।

কনস্ট্যান্টিনোপল শহরটি সমুদ্রবেষ্টিত। খোলা দিকগুলোতে সমুদ্রের অথৈ জলরাশি শহরকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করছিল। আর অন্যান্য দিকে ছিল বড় বড় প্রাচীর। দক্ষিণে রয়েছে মার্মারা উপসাগর। শহরের পুরো দক্ষিণ দিককে ঘিরে রেখেছে এটি। মার্মারা উপসাগর মিশেছে কৃষ্ণ সাগরে গিয়ে। আবার মার্মারা উপসাগর থেকে নির্গত হয়েছে একটি প্রণালী, যা শহরের উত্তর-পূর্ব অংশে বসফরাস প্রণালী নাম ধারণ করে শহরের সাথে গিয়ে ঠেকেছে। এই বসফরাস প্রণালী বয়ে গেছে এশিয়া ও ইউরোপের মাঝামাঝি। বলা যায়, এটি এশিয়া ও ইউরোপের পৃথককারী। আনাতোলীয় অঞ্চলকে থ্রেস থেকে আলাদা করেছে এটি।

বসফরাস প্রণালী থেকে একটি মোহনা বেরিয়েছে। নাম গোল্ডেন হর্ন। গোল্ডেন হর্ন বসফরাস প্রণালী থেকে বেরিয়ে ইউরোপ মহাদেশ অভিমুখে বয়ে যাওয়া মোহনা। মোটকথা, কনস্ট্যান্টিনোপল শহরের তিনদিকই জলবেষ্টিত। মার্মারা, বসফরাস ও গোল্ডেন হর্ন। প্রতিটি জলভাগ অপর জলভাগের সাথে শিকল দিয়ে সংযুক্ত ছিল। মার্মারার স্থলভাগ থেকে গোল্ডেন হর্ন পর্যন্ত ছিল দুটি প্রাচীর। এর মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে লায়কুস নদী।

শহরের জলবিহীন একমাত্র দিকটি উন্মুক্ত। কিন্তু এই অংশটি একটি তিনগুণ পুরু প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। যার নাম থিউডোসিয়ান ওয়াল। সুতরাং সবমিলিয়ে বলা যায়, কনস্ট্যান্টিনোপল ছিল সামরিকভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে সুরক্ষিত শহর। একে

জয় করা একপ্রকার অসাধ্য।

ব্যর্থ প্রচেষ্টা

হযরত উসমানের (রদিয়াল্লাহু আনহু) খিলাফতকালে মুআবিয়ার (রদিয়াল্লাহু আনহু) সেনাপতিত্বে দ্বিতীয় কনস্ট্যান্টাইনের বিপক্ষে আনাতোলীয় অঞ্চলে বহুবার আক্রমণ করা হয়েছে। কিন্তু জয় করা সম্ভব হয়নি।

এরপর যখন মুআবিয়া (রদিয়াল্লাহু আনহু) নিজে খলীফা হলেন, তখন প্রসিদ্ধ সাহাবিদের নিয়ে চূড়ান্ত হামলার জন্য সৈন্য সন্নিবেশ করলেন তিনি। নেতৃত্ব তুলে দিলেন সাহাবি বুসর বিন আরত্বাহর হাতে। এটি ৪৩ হিজরি সনের (৬৭২ খ্রিস্টাব্দে) ঘটনা। বুসর বিন আরত্বাহের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী কনস্ট্যান্টিনোপল শহর সাতমাস ধরে জয় করার চেষ্টা করল। কিন্তু সফল হলো না তারা। বরং এই সাতমাস ধরে অনবরত হামলা-পালটা হামলায় মুসলিম বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিছু প্রসিদ্ধ সাহাবি-সহ ত্রিশহাজার মুসলিম শহীদ হন এই সময়ে।

এছাড়াও কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করতে এগিয়ে যাওয়া মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ছিলেন আবূ আইয়ুব আল আনসারীর (রদিয়াল্লাহু আনহু) মতো মহান সাহাবিও। তিনি আশি বছর বয়সে বৃদ্ধাবস্থায় মুসলিম বাহিনীতে অংশ নেন এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের পাশেই ইন্তিকাল করেন।

পরবর্তীতে উমাইয়া খলীফা সুলায়মান ইবনু আবদিল মালিকও অবরোধ করেন কনস্ট্যান্টিনোপল। কারণ, হাদীসে এও আছে যে, কনস্ট্যান্টিনোপল বিজেতার নাম কোনো একজন নবির নামই হবে। তাই খলীফা সুলায়মান আশা করছিলেন যে, তিনিই সেই ব্যক্তি। বিজয়ের লক্ষ্যে যা কিছু দরকার, সবই করলেন তিনি। এক লক্ষ আশি হাজারের বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে কনস্ট্যান্টিনোপলের উদ্দেশ্য মার্চ করিয়ে দিলেন। এই বাহিনী খুবই বড় ও শক্তিশালী ছিল বটে, তবে শুধুমাত্র স্থলবাহিনী দিয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করা অসম্ভব। বাইজেন্টাইনদের নৌবাহিনীর দক্ষতার সামনেই মূলত মুআবিয়ার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। তাই সুলায়মান ইবনু আবদিল মালিক ১৮শ'র বেশি জাহাজ তৈরি করার আদেশ দেন। কিন্তু তারপরেও কোনো লাভ হলো না।

উমাইয়া খলীফা সুলায়মানের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল খ্রিষ্টান রোমান জেনারেল লিওকে বিশ্বাস করা। লিও চাইত কনস্ট্যান্টিনোপলের রাজা হতে। কনস্ট্যান্টিনোপলের তৎকালীন রাজার সাথে সম্পর্ক ভালো ছিল না তার। তাই মুসলিম বাহিনী তার সাথে চুক্তি করে শহর দখল করতে চেয়েছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিরোধ যা-ই হোক, মুসলিমদের হাতে কনস্ট্যান্টিনোপল তুলে দিতে মোটেও রাজি ছিল না লিও। তাই সুযোগমতো সে মনোভাব পাল্টে ফেলে। এমনকি হামলাও করে মুসলিম নৌবহরের ওপর। ফলে সুলায়মানের যুগেও মুসলিমদের কনস্ট্যান্টিনোপল অভিযান শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। শহীদ হলেন অসংখ্য সৈন্য। ১৮০০ জাহাজের মাঝে বেঁচে ফিরল অল্প ক'টা। এরমধ্যে সুলায়মান ইবনু আবদিল মালিক ইন্তিকাল করলে উমার ইবনু আবদিল আযীয খলীফা হন। খলীফার আসনে বসা মাত্রই তিনি মুসলিম বাহিনীকে অতিসত্বর ফেরত আসার আদেশ দেন। সুযোগ্য এই খলীফার এই আদেশও যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয়। কারণ মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরীণ অনেক সমস্যা তখন সমাধা করা বাকি ছিল, যা উমার ইবনু আবদিল আযীয সফলভাবে সম্পন্ন করেন।

তবে লিওর বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষয়ক্ষতি আর কাটিয়ে ওঠা যায়নি। পরবর্তী ৭৩৫ বছর আর কনস্ট্যান্টিনোপলে অভিযান চালাতে পারেনি মুসলিমরা। কনস্ট্যান্টিনোপলের প্রাচীর অজেয় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রায় আট শতাব্দী।

উসমানী নবোদ্যম

এরপর এলো উসমানীয় খিলাফাহ, দ্য গ্রেট অটোমান এম্পায়ার। কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের চেষ্টা নতুন উদ্যমে শুরু করল তারা। ১৩৯৩ সালে উসমানীয় সুলতান বায়েজিদ ইয়িলদিরম কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করেন। প্রায় জয় করেই ফেলেছিলেন এই অপরাজেয় খ্যাত শহরটা। কিন্তু হতে গিয়েও হলো না। আরেক মঙ্গোল শাসক তৈমুর লংয়ের অধীন বাহিনী উসমানীয় সাম্রাজ্যে আক্রমণ করে লুটপাট শুরু করায় বায়েজিদকে কনস্ট্যান্টিনোপলের অবরোধ তুলে আনাতোলিয়ায় ফিরে যেতে হয়। মনোযোগ দিতে হয় মঙ্গোলদের আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্য রক্ষায়।

এরপর সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ আবারও চেষ্টা করেন। বিফলে গেল তার সকল প্রচেষ্টাও। কনস্ট্যান্টিনোপলের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের সামনে আছড়ে পড়ল উসমানীয়দের সকল প্রচেষ্টা।

আল-ফাতিহ

অতঃপর রাজত্ব এলো সুলতান মুরাদের ছেলে সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ'র হাতে। তুর্কিরা তাঁকে 'মেহমেত' নামে জানে। মুহাম্মাদ আল ফাতিহ ছোটবেলা থেকেই ছিলেন ধীমান। খুব দ্রুত পড়াশোনার পাঠ শেষ করেন তিনি। তাঁর পিতা সুলতান মুরাদ তাঁকে অসাধারণভাবে শিক্ষিত করেছেন। সেই শিক্ষার বলে মুহাম্মাদ আল ফাতিহ একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে গড়ে ওঠেন।

আরবি ছাড়াও আরও ছয়টি ভাষায় তাঁর ছিল মাতৃভাষার মতো দক্ষতা। তুর্কি, ল্যাটিন, ফারসি, গ্রিক, হিব্রু, এবং স্লাভ। এছাড়া গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ও দর্শনশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর আরও একটি বিশেষ গুণ ছিল আলিম-উলামা ও বিজ্ঞজনদের প্রতি ভালোবাসা ও তাঁদের সার্বক্ষণিক সঙ্গ। নিজেও ছিলেন বড়মাপের জ্ঞানী। তাঁর ওস্তাদ হিসেবে অনেকে শাইখ আহমাদ ইবনু ইসমাঈল কাওরানির কথা বলেন। আহমাদ ইবনু ইসমাঈল কাওরানি ছিলেন তাঁর সময়ে ইমাম আবূ হানিফার মতোই প্রসিদ্ধ। শাইখ আহমাদের কাছে মুহাম্মাদ আল ফাতিহ কুরআনুল কারীম হিফজ করেন। পড়াশোনায় এতটাই দক্ষ ছিলেন যে, ইমাম আস সুয়ুতির অনেক প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতেন।

ব্যক্তিজীবনেও খুবই পরহেযগার ছিলেন মুহাম্মাদ আল ফাতিহ। রাত্রিকালে মাসজিদে যাপন করতেন। পাঁচওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন মাসজিদে জামাআতের সাথে। হাসিঠাট্টা, মশকরা ও অনর্থক কৌতুক একেবারেই অপছন্দ করতেন।

মনোযোগী ছাত্র হবার পাশাপাশি ছিলেন দক্ষ ঘোড়সওয়ার ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।

মুহাম্মাদ আল ফাতিহ ছোটবেলা থেকে একটা জিনিস খুব ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তা হলো, কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়াভিযান ব্যর্থ হবার কারণসমূহ। কনস্ট্যান্টিনোপল সংক্রান্ত সবকিছু ছোটবেলা থেকেই ভালোভাবে জেনে নিয়েছেন তিনি। সেখানকার ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা—সবকিছু। আর কুনস্তুই তিনি মাথায় গেঁথে নিয়েছিলেন। আর কুসতুনতিনিয়া বিজয়ের হাদীসটি তো জানতেনই আর সবার মতো।

সুলতান হিসেবে অভিষেক

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ রাজ্যপাট পরিচালনা করতে করতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সংঘাত, রাজনীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ আর ভালো লাগছিল না তাঁর। তিনি চাইছিলেন সবকিছু ছেড়েছুড়ে দূরে কোথাও গিয়ে ইবাদাতে মনোনিবেশ করতে। তাই তিনি শাসনভার পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন পুত্র মুহাম্মাদের হাতে। তখন মুহাম্মাদের বয়স মাত্র বারো বছর। যোগ্যতা, মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তির বলে অল্পবয়সেই তিনি রাজ্য পরিচালনার যোগ্য প্রমাণিত হন।

কিন্তু অভ্যন্তরীণ সমস্যা, বিদ্রোহ ও সীমান্তে শত্রুদের হামলার কারণে সুলতান মুরাদকে বাধ্য হয়ে দরবেশি জীবন ছেড়ে আবারও রাজধানীতে ফিরে ক্ষমতা হাতে তুলে নিতে হয়। অতঃপর ১৪৫১ সালে তাঁর মৃত্যু হলে মুহাম্মাদ আল ফাতিহ ১৯ বছর বয়সে সুলতান ও মুসলিম জাহানের খলীফা হিসেবে অভিষিক্ত হন।

সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ হাদীসে বর্ণিত সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে যা কিছু করতে হয়, সবই করে প্রস্তুত হন তিনি। ১৪৫২ সালের ডিসেম্বর অথবা ১৪৫৩ সালের জানুয়ারির মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। কিন্তু সবই গোপনে। এমনকি নিজের সেনাবাহিনীকেও বুঝতে দিলেন না আসল উদ্দেশ্য। কারণ, কাফিররা কয়েকমাস সময় পেলেই প্রস্তুতি নিয়ে ফেলবে। তাই ১৪৫৩ সালের ১৪ই জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তিনি।

নব-উদ্ভাবন

মুহাম্মাদ আল ফাতিহ বেশকিছু নতুন উপায় আবিষ্কার করেন।

প্রথমত, বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের সংখ্যাবৃদ্ধি। সব মিলিয়ে সেনাবাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় দশ লক্ষের চেয়ে বেশি। সেসময়ে এটাই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সৈন্যবাহিনী।

দ্বিতীয়ত, সর্বাত্মক প্রশিক্ষণ। সে যুগে যা যা যুদ্ধকৌশল আবিষ্কৃত হয়েছিল, তার কোনোটাই সেনাবাহিনীকে শেখাতে বাকি রাখলেন না।

উসমানীয়রাই সর্বপ্রথম সেনাবাহিনীতে একটি চৌকস ও স্থায়ী বিশেষ ইউনিট প্রবর্তন করে। তাদের দেওয়া হতো বিশেষ প্রশিক্ষণ, বিশেষ খাবার, ও বিশেষ পোশাক। মোটকথা, তারা সাধারণ সৈনিকদের মতো ছিল না। এই বিশেষ বাহিনীর নাম ছিল 'জানিসারি' বাহিনী। মুহাম্মাদ আল ফাতিহ এই জানিসারি বাহিনীর প্রশিক্ষণের মাত্রা বাড়িয়ে তাদেরকে আরও ক্ষিপ্র করে তোলেন।

তৃতীয়ত, সেনাবাহিনীর মাঝে আলিমগণের মাধ্যমে জিহাদী চেতনা উদ্দীপ্ত করা। তাদেরকে কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের সুসংবাদ সম্বলিত হাদীস শোনানো হতো। এভাবে মানসিকভাবে বলীয়ান করা হতো তাদেরকে।

চতুর্থত, দূর্গ নির্মাণ। সুলতান মুহাম্মাদের পরদাদা সুলতান বায়েজিদ বসফরাস প্রণালীর তীরে উসমানীয়দের অধিকৃত অংশে একটি দূর্গ তৈরি করেছিলেন। সেটি ছিল এশিয়ান উপকূলীয় অংশে। দূর্গের নাম 'আনাদুলু হিসার'। সুলতান মুহাম্মাদ ইউরোপীয় উপকূলের পূর্বাংশে আরেকটি দূর্গ তৈরি করে কনস্ট্যান্টিনোপলে ইউরোপের জাহাজ ঢোকার পথ একপ্রকার রুদ্ধ করে দেন। নতুন এই দূর্গের নাম 'রুমেলি হিসার'। আনাদুলু হিসার ও রুমেলি হিসার ছিল একদম সমান্তরাল অবস্থানে। রুমেলি দূর্গ নির্মাণে সময় লেগেছিল মাত্র ১৩৯ দিন। ১৪৫২ সালের আগস্ট মাসে এই দূর্গ উদ্বোধন করা হয়।

রুমেলি দূর্গ ও আনাদুলু দূর্গের অবস্থান সামরিক দিক থেকে উসমানীয়দের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইউরোপ থেকে কৃষ্ণসাগর হয়ে আসা রসদ ও অস্ত্রবাহী যেকোনো জাহাজ বসফরাস প্রণালীর মধ্য দিয়ে কনস্ট্যান্টিনোপলে যেতে হলে এই দুই শত্রুদূর্গের মাঝখান দিয়ে যেতে হতো। দূর্গ থেকে জাহাজগুলোতে হামলা করে ডুবিয়ে দেওয়া ছিল খুবই সহাজ্জ। সুতরাং দূর্গদ্বয় তৈরির পদক্ষেপ কনস্ট্যান্টিনোপলের জন্য একপ্রকার অর্থনৈতিক অবরোধ হয়ে দাঁড়ায়। বন্ধ হয়ে যায় বহির্বিশ্ব থেকে সাহায্য আসা।

পঞ্চমত, কনস্ট্যান্টিনোপলের ভূমি, পানি, রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ ও অবস্থান সহ যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ।

যেমন কুকুর তেমন মুগুর

কনস্ট্যান্টিনোপল শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিরোধব্যবস্থা ছিল অপরাজেয় প্রাচীর খ্যাত থিওডোসিয়ান ওয়াল। তাই মুহাম্মাদ আল ফাতিহ একজন হাঙ্গেরীয় কামান প্রকৌশলো নিয়োগ দেন। তার নাম অরবান। তাকে তার দাবির চেয়ে চারগুণ বেতন দিয়ে সন্তুষ্ট রাখেন মুহাম্মাদ। তার কাজ ছিল, কামানের নকশা আঁকা। এমন এক কামান, যা সে সেই ঐতিহাসিক প্রাচীরে ফাটল ধরাতে সক্ষম। যেমন কুকুর, তেমন মুগুর।

সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ নিজেও একজন দক্ষ প্রকৌশলী ও গণিতবিদ। নিজেও অনেকগুলো কামান ডিজাইন করেছিলেন তিনি। তবে তার দরকার ছিল প্রাচীর ভেদ করার মতো কামান। অরবানের সাথে মিলে দিনরাত খাটাখাটনি করেন সেরকম এক প্রাচীরের নকশার পেছনে।

অতঃপর সেই বহুল আরাধ্য কামান নির্মিত হলো। এটি সেসময়ের সবচেয়ে বড় ও দুর্ধর্ষ কামান। লম্বায় ২৬ ফুট, প্রস্থে ৬ ফুট। এই কামান বহন করতে প্রয়োজন হতো ৬০ টি ষাঁড়। কামানের একেকটি গোলা প্রায় ১.২ টন। একেকটি গোলার পাল্লা প্রায় এক মাইল। গোলাটি যেখানে পড়তো, সেখানে তৈরি হতো প্রায় ৬ ফুট গভীর গর্ত।

এছাড়াও তিনি বসফরাস প্রণালী, কৃষ্ণসাগর ও মার্মারা উপসাগরে প্রচুর যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন করেন। বিশেষভাবে কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমণের উদ্দেশ্যেই এগুলো তৈরি। বাইজেন্টাইনরা এ বিষয়টি কল্পনাই করতে পারেনি। তাদের জন্য উসমানীয়দের নৌবহর ও কামান ছিল চমকের মতো।

এটিই হলো আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের স্বরূপ। আল্লাহকেই বিজয়দাতা বলে বিশ্বাস করা। কিন্তু নিজেরা হাত গুটিয়ে বসে না থেকে এর জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

বাইজেন্টাইন প্রতিরক্ষাব্যবস্থা

এবার দেখা যাক, কনস্ট্যান্টিনোপলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল। মার্মারা থেকে গোল্ডেন হর্ন পর্যন্ত ছিল দুটি প্রাচীর। দুই প্রাচীরের মাঝে ষাট ফুট লম্বা পরিখা। ভেতরের প্রাচীরটি বাইরেরটির তুলনায় চল্লিশ ফুট উঁচু। বাইরেরটির উচ্চতা ২৫ ফুট।

ভেতরের প্রাচীরের ওপর আবার ষাট ফুট উঁচু কিছু টাওয়ার। তিনদিকের দুদিকেই এমন শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

একমাত্র দুর্বল দিক ছিল গোল্ডেন হর্নের দিকটি। বসফরাসের এই মোহনায় কোনো প্রাচীর নেই। তবে এর প্রতিরক্ষাব্যবস্থার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ ছিল সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের। তাই কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে গোল্ডেন হর্ন পর্যন্ত শহরের নৌপ্রবেশ মুখে একটি শেকল ছিল। এই বিশাল শেকল এমনভাবে বসানো, যাতে কোনো জাহাজ অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করতে না পারে। করতে গেলেই শেকল টেনে জাহাজের তলা ফাটিয়ে জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া যেত।

যেহেতু পুরো শহরটিই জল, প্রাচীর ও শেকলে পরিবেষ্টিত, তাই তারা শহর রক্ষার ব্যাপারে ছিল খুবই আত্মবিশ্বাসী। শক্তিশালী নৌবাহিনীর জল অংশের প্রহরায় অন্যান্য খ্রিষ্টান রাজ্যের জাহাজ ঢুকে যেতে পারতো কনস্ট্যান্টিনোপলে। তাই স্বাভাবিকভাবেই নির্ভার ছিল তারা।

তাছাড়া অর্থোডক্স ও ক্যাথলিক উভয় ঘরানার খ্রিষ্টানদের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ স্থান এই কনস্ট্যান্টিনোপল। তাদের মাঝে অন্তঃকলহ থাকলেও সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের আহ্বানে দুই দলই সুলতান মুহাম্মাদের বিপক্ষে ঐক্যবদ্ধ থাকে।

কামানের প্রথম গর্জন

এপ্রিল মাস, ১৪৫৩ সালের বসন্তকাল।

উসমানীয়দের পক্ষ থেকে সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের নেতৃত্বে কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ শুরু হলো। গর্জে উঠল সুলতানের পরামর্শে অরবানের তৈরি করা কামান। একইসাথে নদীপথে শুরু হলো নৌবাহিনীর হামলা। আক্রমণ শুরু করার আগে সম্মিলিত বাহিনীকে আরো একবার জিহাদের প্রয়োজনীয়তা, কনস্ট্যান্টিনোপল শহরের গুরুত্ব ও আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার ফজিলত শোনানো হলো। সেনাবাহিনীতেও বহু আলিম ছিলেন, যাদের কাজ ছিল সেনাবাহিনীকে যুদ্ধজয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

সমগ্র বাহিনীকে তিনভাগে ভাগ করা হলো। একভাগ নদীতে। একভাগ স্থলে। যারা কনস্ট্যান্টিনোপল শহরের পশ্চিম দিকে ছিল। আরেকভাগ ছিল সুলতানের সাথে।

৬ই এপ্রিল, ১৪৫৩ সাল।

সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ সম্রাট একাদশ কনস্ট্যান্টাইনকে যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী শহর ছেড়ে দিতে বলেন। তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পরিজনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলেন তাকে। সম্রাট সেটা প্রত্যাখান করলেন।

এরপর অরবানের নির্মিত কামান দিয়ে গোলা নিক্ষেপের আদেশ দিলেন সুলতান। উসমানীয় বাহিনীর দিক থেকে উত্তর থিউডোসিয়ান প্রাচীর লক্ষ্য করে গোলা নিক্ষেপ শুরু হলো। গোলার আঘাতে ধ্বসে গেল প্রাচীরের বড় অংশ। কিন্তু একবার গোলা নিক্ষেপের পর কামান পুনঃপ্রস্তত করতে সময় লাগত কয়েক ঘণ্টা। এই সময়টুকু কাজে লাগিয়ে বারবার প্রাচীর মেরামত করে ফেলে বাইজেন্টাইন প্রকৌশলীরা।

মুসলিম বাহিনীর মূল ভরসার জায়গা ছিল কামানটি। তাই সুলতান আশা হারালেন না। বারবার গোলা নিক্ষেপ চালিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। দিনের পর দিন থিউডোসিয়ান প্রাচীর বরাবর চলতে থাকল গোলা নিক্ষেপ। অপরদিকে শক্তি প্রদর্শন করে বাইজেন্টাইন বাহিনীর মনে ভয় ধরিয়ে দেয়ার জন্য সুলতানের বাহিনী গ্রীকদের কিছু দূর্গ দখল করে নেয়।

গোল্ডেন হর্নের দুর্ভেদ্য শেকলটি ছিল মুসলিমদের আরেক মাথাব্যথা। সম্রাট একাদশ কনস্ট্যান্টাইনের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন জেনোয়ার সম্রাট ও সেনাপতি জাসটিনিয়ান। তার সাথে ছিল পাঁচটি জাহাজে সাতশো সৈনিকের এলিট ফোর্স। মুসলিমদের অবরোধে কোনো জাহাজ কনস্ট্যান্টিনোপলে ঢুকতে না পারলেও জাসটিনিয়ানের জাহাজ তীব্র প্রতিরোধের মুখে বসফরাস প্রণালী অতিক্রম করে বন্দরে ঢুকে যায়। তাদের জাহাজের জন্য গোল্ডেন হর্নের শেকল খোলা হলো। মুসলিমরাও ঢুকে যেতে চাইলো এই সুযোগে। কিন্তু বাইজেন্টাইনরা তড়িঘড়ি করে সময়মত শেকল তুলে দেয়।

এই সময়ে তীব্র লড়াইয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলো মুসলিম বাহিনীর। শহীদ হয়ে গেলেন অনেকে। কিন্তু লাভ হলো না। অন্যদিকে থিউডোসিয়ান ওয়ালে তীব্র গোলা নিক্ষেপের পরেও পাওয়া যাচ্ছিল না আশাব্যঞ্জক ফলাফল। মুসলিমরা কনস্ট্যান্টিনোপলে প্রবেশ করার কোনো ফাঁকফোকরই দেখতে পাচ্ছিল না।

জলের প্রাণী স্থলে

১৮ই এপ্রিল।

কামানের পরপর চারটি গোলা থিওডোসিয়ান ওয়ালে একটি বড় ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়। এই সুযোগে বাইজেন্টাইনদের প্রতিরক্ষা ভেঙে শহরে ঢুকে যায় জানিসারি বাহিনী। চারঘন্টা তীব্র রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর এই প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখল। কিন্তু ভেতরে থাকা সৈনিকরা প্রাণপণ লড়াই করে জানিসারিদের হটিয়ে দেয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিমদের হাতছাড়া হয়ে যায় এই অনুকূল পরিস্থিতি।

তাছাড়া কাফিরদের জন্য আগত নৌ-সাহায্য রুখতে অনেক চেষ্টা করেও মুসলিম নৌবাহিনী সফল হতে পারছিল না। তাদের আক্রমণ এড়িয়ে শত্রুদের জাহাজ শহরের বন্দরে ঢুকে পড়ছিল। আর শক্তিশালী হচ্ছিল তাদের প্রতিরোধ। নৌবাহিনীর ক্রমাগত ব্যর্থতায় সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ খুবই রুষ্ট হন। নৌবাহিনী প্রধান সুলায়মানকে অপসারণ করে দায়িত্ব দেন জাগান পাশাকে।

সভাসদরা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখে বারবার বলছিল অবরোধ তুলে ফেরত যেতে। কারণ এই শহর অপ্রতিরোধ্য। মুহাম্মাদ আল ফাতিহ তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে ফেরত যেতে অস্বীকার করলেন।

এবার মুহাম্মাদ আল ফাতিহ গভীর চিন্তায় পড়লেন। ভেবেচিন্তে বুঝতে পারলেন, সবচেয়ে দুর্বলদিক তথা গোল্ডেন হর্নের দখল নিতে না পারলে এই শহর বিজয় অসম্ভব। এর অর্থ, থিউডোসিয়ান ওয়াল থেকে বাহিনী সরিয়ে তাদেরকে গোল্ডেন হর্ন অভিমুখে নিয়ে আসতে হবে। নতুন করে সাজাতে হবে বিন্যাস। তবে থিউডোসিয়ান ওয়ালেও অব্যাহত রাখতে হবে আক্রমণ। কিন্তু কীভাবে?

এই ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে তিনি এক অভূতপূর্ব পরিকল্পনা করলেন। এবং তা বাস্তবায়নও করলেন। পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে এমন পদক্ষেপ অদ্বিতীয়। বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি পেয়েছে তাঁর এই অভিনব পরিকল্পনা। শত্রুরাও হয়েছে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গ্রীকরাও স্বীকার করে যে, সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের বিজয়কৌশল আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের চেয়েও দ্রুততর এবং অবিশ্বাস্য।

২১শে এপ্রিল।

সুলতান নির্দেশ দিলেন, পাহাড়ি উপত্যকার ওপর দিয়ে গাছের গুড়ি ফেলে রাস্তা তৈরি করার জন্য। এজন্য প্রয়োজন হবে হাজার হাজার গাছের। সুলতানের আদেশে হাজার হাজার গাছই কাটা হলো। পুরো প্রস্তুতিটি চলছিল শত্রুদের সম্পূর্ণ অগোচরে।

গাছগুলো কেটে বসফরাসের পাড়ে সমতল ভূমিতে বিছানো হলো। রুমেলি হিসার দুর্গ থেকে যে সমতল ভাগটি গোল্ডেন হর্নের সাথে মিশেছে, সে অংশটির পুরোটাতেই বসানো হলো গাছের গুড়ি। তারপর সেই গাছের গুড়িগুলোর ওপর তেল ও চর্বি মেখে পিচ্ছিল করা হলো। উদ্দেশ্য, সেগুলোর ওপর দিয়ে জাহাজ টেনে নিয়ে যাওয়া!

উসমানি যুদ্ধজাহাজগুলো আয়তনে ছোট এবং ওজনে হালকা। সুলতান সেনাবাহিনীকে আদেশ করলেন তেল ও চর্বি মাখানো গাছের গুড়িগুলোর ওপর দিয়ে সত্তরটি জাহাজ টেনে গোল্ডেন হর্নে নিয়ে ফেলতে। তা-ই করা হলো! জাহাজগুলোকে বসফরাস থেকে টেনে নেওয়া হয় স্থলভাগে। সেখানে তিন মাইলব্যাপী রাস্তায় তেল ও চর্বি ঢেলে পিচ্ছিল করে দেওয়া তক্তা বসানো। মুসলিম বাহিনী শত্রুবাহিনীর অগোচরে সত্তরটিরও বেশি জাহাজ গোল্ডেন হর্ন প্রণালীতে নিয়ে যেতে এবং অবতরণ করাতে সক্ষম হয়।

সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের আগে কেউ ভাবতেও পারেনি এ কৌশল। সে রাতে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে এ কাজের তদারকি করেছিলেন। শত্রুরা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি তা। এটি আল্লাহ তাআলারই কুদরত। একরাত্রির মধ্যে সত্তরটি জাহাজ মানুষের হাতে টেনে তিনমাইল দূরের সমুদ্রে ভাসানো আল্লাহর কুদরত ও সাহায্য ছাড়া সম্ভব হতো না।

পরদিন কনস্ট্যান্টিনোপল শহরবাসী জেগে উঠল মুসলিম নৌবহরের কোলাহল আর মুসলিম বাহিনীর তাকবীর শুনে। গোল্ডেন হর্নের প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় নিয়োজিত সৈনিকরা অবাক হয়ে দেখল গোল্ডেন হর্ন উসমানীয় জাহাজে ভর্তি। তা মুসলিমদের দখলে চলে গেছে! উসমানীয়দের জাহাজ গোল্ডেন হর্নে থাকা কাফিরদের জাহাজগুলো ধ্বংস করে ফেলে।

নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না তারা। বুঝতেই পারছিল না যে, সমুদ্রের জাহাজ স্থলে কী করে চললো!

মাটির তলায় আতঙ্ক

খ্রিষ্টান বাহিনীর সামনে এখন দুটি বিপর্যয়। শুধু পশ্চিম প্রাচীরের সুরক্ষা নয়, এখন গোল্ডেন হর্ন নিয়েও ভাবতে হচ্ছে। এদিকে মুসলিমরা থিওডোসিয়ান ওয়ালে হামলার মাত্রা বাড়িয়ে দিল। বেড়েই চললো যুদ্ধের তীব্রতা। এসবের পাশাপাশি সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ একটি সুড়ঙ্গপথ খনন করা শুরু করতে চাইছেন, যেটি সরাসরি শহরের ভেতর গিয়ে শেষ হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলিম বাহিনী বিভিন্ন দিক থেকে শহরের অভ্যন্তর অভিমুখে সুড়ঙ্গ খনন করতে থাকে। বাইজেন্টাইনরা তাদের মাটির নিচে বিকট আওয়াজ শুনতে পায়, যা ক্রমে ক্রমে শহরের নিকটবর্তী হচ্ছিল। জলদি করে সম্রাট তার সেনাপতি এবং পরামর্শকদের নিয়ে আওয়াজের উৎসের দিকে যান। তারা বুঝতে পারে যে, উসমানীয় বাহিনী শহরে প্রবেশের জন্য মাটির নিচে সুড়ঙ্গ খনন করছে। তাই মুসলিম বাহিনীকে ধোঁকায় ফেলার জন্য তারাও সুড়ঙ্গপথ খনন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

উসমানীয়রা খ্রিষ্টানদের বানানো সুড়ঙ্গের কাছে পৌঁছে ভাবলেন যে, গন্তব্য কাছে চলে এসেছে। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি তাদের আনন্দ। বাইজেন্টাইনরা অতর্কিতে বেরিয়ে এসে তাদের ওপর আগুনের গোলা এবং জ্বালানী তেল নিক্ষেপ করে। ফলে শ্বাসরোধ হয়ে বা শরীর পুড়ে শহীদ হন অনেকেই। ফিরতি পথ চেনা থাকায় ফিরে আসতে সক্ষম হন বাকিরা।

কিন্তু মুসলিমরা থেমে রইল না। একের পর এক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেই লাগল তারা। এক সুড়ঙ্গে তেল ঢেলে দিলে খুঁড়তে লাগল অন্য সুড়ঙ্গ। গোলার আঘাতে ফাটল ধরা প্রাচীরের বিভিন্ন অংশ দিয়েও চলছে ঢোকার চেষ্টা। শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ হয়নি। তারা স্থলের একটি জায়গা ও গোল্ডেন হর্ন প্রণালির মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আরও কয়েকটি সুড়ঙ্গ খনন করে। এ কাজের জন্য এ স্থান ছিল খুবই উপযুক্ত। তারা অবরোধের শেষ দিন পর্যন্ত এ কাজ অব্যাহত রাখে।

মোটেও সহজ ছিল না এ কাজ। কেননা, এ গর্ত খনন করতে গিয়ে তাদের অনেক জীবনের দাবি মেটাতে হয়েছিল। অনেকেই মাটির নিচে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। অনেকে বন্দি হয় বাইজেন্টাইনদের হাতে। তাদের মাথা কেটে সেগুলো মুসলিম সৈন্যবাহিনীর দিকে নিক্ষেপ করা হয়।

কিন্তু মুসলিমরাও কনস্ট্যান্টিনোপলের অধিবাসীদের মনে সৃষ্টি করে চলছিল এক হৃদয়ে আতঙ্ক। তারা গর্ত খননের অস্পষ্ট আওয়াজকে মনে করতে থাকে মুসলিমদের পায়ের আওয়াজ। মনে হচ্ছিল এই বুঝি মাটি ফুঁড়ে উসমানীয় সৈন্যরা বের হয়ে শহরময় ছেয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَ اَعِدُّوا لَہُم مَّا استَطَعتُم مِّن قُوَّۃٍ وَّ مِن رِّبَاطِ الخَیلِ تُرہِبُونَ بِہٖ عَدُوَّ اللّٰہِ وَ عَدُوَّکُم وَ اٰخَرِینَ مِن دُونِہِم ۚ لَا تَعلَمُونَہُم ۚ اَللّٰہُ یَعلَمُہُم ؕ وَ مَا تُنفِقُوا مِن شَیءٍ فِی سَبِیلِ اللّٰہِ یُوَفَّ اِلَیکُم وَ اَنتُم لَا تُظلَمُونَ

"আর তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত রাখ শক্তি ও অশ্ব বাহিনী, তা দিয়ে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।"[৭২]

চলন্ত কেল্লা

স্থলপথে জাহাজ আর মাটির নিচে শব্দ। বাইজেন্টাইনদের অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা এখানেই শেষ নয়। নানাভাবে ব্যর্থ হয়ে উসমানীয়রা তাদের হামলায় আরও একটি নতুন পদ্ধতি যোগ করে।

একটি বিরাট, লম্বা চলমান কাঠের কেল্লা নির্মাণ করে তারা। এটা ছিল প্রাচীরের তুলনায় উঁচু। আগুন প্রতিরোধের জন্য তা বর্ম এবং পানিতে ভেজানো চামড়া দিয়ে বেষ্টিত ছিল। নির্মিত এই কেল্লার প্রতিটি স্তরে সেনা মোতায়েন করা হয়। প্রাচীরের ওপর থেকে যারাই উঁকি দিত, তাদের মাথা লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করত কেল্লার ওপরের স্তরে থাকা তিরন্দাজ সৈন্যরা। মুসলিমরা চলমান এই কেল্লার মাধ্যমে আক্রমণ করে প্রাচীরের ফটকের কাছাকাছি চলে যায়। সেনাপতিদের নিয়ে এই চলমান কেল্লার প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেন স্বয়ং বাইজেন্টাইন সম্রাট। কিন্তু উসমানীয়রা অবশেষে কাঠের কেল্লাকে কনস্ট্যান্টিনোপলের প্রাচীরে ঠেকাতে সক্ষম হয়।

[৭২] সূরা আনফাল, ৮:৬০।

এরপর কেল্লায় থাকা মুসলিম সেনা এবং প্রাচীরের কাছে থাকা প্রতিরোধকারীদের মাঝে হয় তুমুল রক্তক্ষয়ী লড়াই। কতক মুসলিম সৈন্য প্রাচীরে ওঠার চেষ্টায় সফল হয় শেষমেশ। কিন্তু প্রতিরোধকারী খ্রিষ্টান বাহিনী কেল্লা উদ্দেশ্য করে ঘন ঘন আগুন নিক্ষেপ করা অব্যাহত রাখে, যা বেশ ফলপ্রসূ হয়। এই হামলায় এগিয়ে থাকে তারা। পুড়ে যায় কাঠের কেল্লা। কিন্তু আগুন পার্শ্ববর্তী বাইজেন্টাইন প্রাচীরে পৌঁছে গেলে সেখানে অবস্থান নেওয়া প্রতিরোধকারী সৈন্যরাও নিহত হয়ে যায়।

এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরেও মুসলিমরা দমে যায়নি। সুলতান নিজে এ কাজের তদারকি করছিলেন। তিনি আরও চারটি এমন কেল্লা নির্মাণ করার আদেশ দেন।

অলৌকিক ইঙ্গিত

২৪শে মে।

অবরোধ আরও শক্তিশালী করা হয়। শহরের তিনদিক থেকে মুসলিমরা পুরোদমে হামলা শুরু করে। কিন্তু বাইজান্টাইনরাও ছিল সাহসী সৈনিক। অসীম বীরত্ব সহকারে শহর রক্ষায় প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল তারা। সম্রাট একাদশ কনস্ট্যান্টাইন নিজেও অটল থেকে নেতৃত্ব দেন যুদ্ধে। যদিও তাকে জনতা শহর থেকে বেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলছিল।

খ্রিষ্টানরা শহর রক্ষার 'পবিত্র ক্রুসেডে' শামিল হয়ে প্রতিশ্রুত স্বর্গের লোভে জীবন উৎসর্গ করছিল। যদিও তাদের জায়গা জাহান্নামেই।

২৫শে মে।

হঠাৎ এমনকিছু ঘটনা ঘটে, যা পুরোপুরি নষ্ট করে দেয় খ্রিষ্টানদের মনোবল। সেদিন শহরের অধিবাসীরা মহীয়সী কুমারী মাতা মারিয়ামের (আলাইহিস সালাম) মূর্তি বহন করে শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে প্রার্থনা করতে থাকে। কাকুতি-মিনতি করে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে তাঁর কাছে। হঠাৎ তাদের হাত থেকে মূর্তি পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। একে অশুভ ইঙ্গিত এবং বিপদের আভাস মনে করে তারা। এ ঘটনা শহরের অধিবাসীদের মাঝে বিশেষ করে প্রতিরোধকারীদের মাঝে বিরাট প্রভাব ফেলে।

পরদিনই ২৬শে মে বজ্রপাতসহ প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। একটি বজ্র পতিত হয় আয়া সুফিয়া গির্জার ওপর। গীর্জার স্তম্ভ ভেঙে যায়। প্রতিরোধ সৈনিকরা সম্রাটের কাছে গিয়ে বলে, ঈশ্বর তাদের জিম্মা ছেড়ে দিয়েছেন এবং খুব শীঘ্রই মুসলিম মুজাহিদদের হাতে পতন হবে এ শহরের। আত্মসমর্পণের আবেদন করে তারা। কিন্তু কনস্ট্যান্টাইন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন।

এবার আক্রমণ আরও জোরদার করেন সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ। বিশেষ করে শহরে কামানের গোলা নিক্ষেপের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। একপর্যায়ে অধিক চাপের ফলে সুলতানের কামানটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। নিহত হয় কামান পরিচালনাকারীরা। হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী অরবানও ছিল নিহতদের মধ্যে।

২৭ তারিখ সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ তাঁর সেনাদের আহ্বান জানান সালাত আদায় এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে কাকুতি মিনতি করার মাধ্যমে অন্তরকে পবিত্র করতে। যেন আল্লাহ তাআলা বিজয়ের পথ সহজ করে দেন। সাধারণ মুসলিম প্রজাদের মাঝেও ছড়িয়ে যায় এ কথা।

অনুরূপ সেদিন সুলতান ফাতিহ শহরের প্রাচীরের এবং অন্যান্য দিকের খোঁজ-খবরও নেন। বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিরোধকারীদের অবস্থা কোন পর্যায়ে, তা জেনে নেন। তিনি কয়েকটি স্থান নির্দিষ্ট করে দেন, যেখানে উসমানিদের হামলা পরিপূর্ণ হবে। তিনি সেখানে সৈন্যদের খোঁজ-খবর নিয়ে তাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাধ্যমতো চেষ্টা এবং নিজেকে উৎসর্গ করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেন। সেদিন রাতে ক্যাম্পে ক্যাম্পে চললো কিয়ামুল লাইল, আল্লাহর দরবারে রোনাজারি।

চূড়ান্ত প্রচেষ্টা

২৯শে মে।

সকালে উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে মুজাহিদগণ একযোগে শহরের ওপর ব্যাপকভাবে হামলা শুরু করেন। এগিয়ে যান প্রাচীরমুখে। বাইজেন্টাইনরা ভীষণ ভয় পেয়ে গির্জায় আশ্রয় নেয়। চূড়ান্ত আক্রমণে একযোগে চলছিল স্থল এবং সামুদ্রিক আক্রমণ। বিশেষ করে মার্মারা সাগর তথা পশ্চিম দিকের প্রাচীরের আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করল। সেদিককার সৈনিকদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিচ্ছিলেন

সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ।

সুলতান কিছুক্ষণ পরপর অগ্রভাগের বাহিনী পেছনে আর পেছনের বাহিনী অগ্রভাগে এনে বহাল রাখছিলেন আক্রমণ। দুইঘন্টা তীব্র আক্রমণের পর সুলতান আক্রমণকারী বাহিনীকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার আদেশ দেন। বাইজেন্টাইনরাও চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করতে থাকে। ঠিক তখনই সুলতান রিজার্ভ রাখা তৃতীয় আরেক বাহিনীকে হামলা করার নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণ পর অন্য আরেক বাহিনী।

খ্রিষ্টানরাও প্রাণপণে লড়ছিল। উদ্যম ছাড়া তাদের কাছে আর কিছুই ছিল না। এদিকে মুসলিম বাহিনীও হাতের কাছে যা কিছু ছিল, তা দিয়েই পুরোদমে হামলা করতে থাকে। তির, পাথর, আগুনের গোলা, সলতে মোড়ানো তির কিছুই বাদ রইল না। অপর পক্ষে সম্রাট একাদশ কনস্ট্যান্টাইন ও জাসটিনিয়ান নিজেরা সৈন্যদের মাঝে এসে তাদেরকে উৎসাহিত করতে থাকেন। হামলার জন্য উজ্জীবিত করেন। তাদের সকল শক্তি ক্ষয় হয়ে যাওয়ার পরেও সাহসী যোদ্ধা হওয়ায় তারা মুসলিমদের জানিসারি বাহিনীর ক্ষিপ্র হামলার মুখে অটল হয়ে রইল। সুলতানের আদেশে জানিসারিরাও লড়তে লাগল প্রতিরোধ ভাঙতে। সারিতে সারিতে পড়তে লাগল তাদের লাশ।

কনস্ট্যান্টিনোপলের শেষ রক্ষা হলো না। কাতারে কাতারে মরেও এগিয়ে যেতে থাকে জানিসারিরা। হাসান নামের একজন বিশাল দেহী কমান্ডার একটা দুর্বল অংশ খুঁজে পেয়ে একাই মই নিয়ে প্রাচীরে চড়ে বসেন। তার হাতে ছিল উসমানীয়দের পতাকা। দূর্গের চূড়ায় চড়ে উসমানীয়দের পতাকা উড়িয়ে দিলেন তিনি।

দুর্বল গোল্ডেন হর্নের প্রহরায় নিয়োজিত সৈনিকরা শক্তিশালী পশ্চিম দূর্গে পতাকা উড়তে দেখে হতাশ হয়ে গেল। যুদ্ধ থামিয়ে পিছু হটলো তারাও। অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল। এর পরপরই কনস্ট্যান্টিনোপলের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় উড়তে লাগল উসমানীয় পতাকা। এরপর খ্রিষ্টানরা যুদ্ধ বন্ধ করে সবদিক থেকে পিছু হটে গীর্জায় আশ্রয় নেয়।

কিন্তু সম্রাট তখনও হাল ছাড়েননি। তিনি এবং জাসটিনিয়ান রাজকীয় পোশাক ছেড়ে সাধারণ সৈনিকের পোশাক পরে অস্ত্র হাতে দূর্গ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। সাধারণ সৈনিকদের কাতারে শামিল হয়ে লড়াই করতে করতে প্রাণত্যাগ করেন বীরের মতো।

অবশেষে বিজয়

সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ যখন বিজয়ীবেশে শহরে প্রবেশ করেন, তখন শহরবাসীরা সকলেই ভয়ে গীর্জায় আশ্রয় নেয়। তারা ধরেই নিয়েছিল সুলতান কোনো রক্তপিপাসু সেনাপতি। কিন্তু সুলতান তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে দেন। স্বস্তি আসে বাইজেন্টাইন জনমনে। তারা জানতে পারে যে, সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ একজন দয়ালু শাসক।

সুলতান তাদের ঘরবাড়ির নিরাপত্তা দেন। ধর্মীয় রীতি-রেওয়াজ পালনের স্বাধীনতা দেন তাদের। শহরের বিচারকার্যে যাদের অধিকার রয়েছে, তাদের সেই ধর্মীয় যাজককে বিচারক হিসেবে নির্বাচনের সুযোগ দেন। আয়া সোফিয়া ছাড়া সচল থাকে বাকী সকল গীর্জা।

বহাল রাখার সুযোগ দেন তাদের অভ্যন্তরীণ নিয়মনীতিও। নিজেদের মধ্যকার বিচারকার্য তারা নিজেদের ধর্ম অনুযায়ীই করবে। শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় অপরাধ কিংবা কোনো মুসলিমকে আঘাত করলে সেক্ষেত্রে এই বিচারের ভার ন্যস্ত হবে মুসলিম বিচারকের হাতে।

সর্বোপরি মুসলিম শাসকের অধীনে কনস্ট্যান্টিনোপলে বসবাসের অনুমতি দেন খ্রিষ্টানদেরকে।

সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ কনস্ট্যান্টিনোপলের নাম পাল্টে নতুন নাম রাখেন 'ইসলাম বুল', যার অর্থ ইসলামের বাগান।

ইউরোপ-বিজেতা

সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ শুধু কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করে থেমে থাকেননি। তিনি ১৪৫৬ সালে গ্রিসের রাজধানী এথেন্স জয় করেন। ১৪৫৯ সালে জয় করেন বসনিয়া ও সার্বিয়া। আর ১৪৭৫ সালে ক্রিমিয়া।

১৪৮১ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মে ইস্কান্দরে ইন্তিকাল করেন হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণীকৃত এই সুলতান ও ইতিহাস-সেরা সেনাপতি।

আজও পশ্চিমের সামরিক স্কুলগুলোতে তাঁকে অধ্যয়ন করা হয়। খালিদ বিন ওয়ালিদ

(রদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তিনি এই দু'জনের সামরিক নীতি পশ্চিমারা আজও অনুসরণ করে।

পরবর্তী লক্ষ্য

কনস্ট্যান্টিনোপল ছাড়াও আরেকটি শহর বিজয়ের সুসংবাদ হাদীসে এসেছে। যে শহরটি জয় করা হবে কনস্ট্যান্টিনোপলের পর। তা হলো রোম। আমরা আশা করি ইনশাআল্লাহ আরও একজন বিজয়ী বীর জন্ম নিবেন, যার হাতে পাশ্চাত্যের পতন হবে। যিনি রোম জয় করে হাদীসের শেষাংশ সত্য করবেন। মুসলিম উম্মাহর বিজয়ের দুরন্ত রথ ছুটে বেড়াবে আবার দিগন্ত থেকে দিগন্তময়। বিশ্ববাসী আবারও শুনবে এই বীর জাতির বীরত্বগাঁথা।

আল্লাহ তাআলা সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের ওপর রহম করুন। তাঁকে উত্তম বিনিময় দিন।

বিপ্লবের অগ্রসেনা

সাইয়িদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহ

এ অধ্যায়ে ইসলামের এমন এক বীরসৈনিকের জীবনী আলোচিত হবে, যিনি বহু মানুষের চিন্তা, চেতনা, মতাদর্শে সরাসরি প্রভাব রেখেছেন। পৃথিবীময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত বহু মুজাহিদের তাত্ত্বিক গুরু তিনি। নাম তাঁর সাইয়িদ কুতুব শহীদ (রহিমাহুল্লাহ)। মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের (মুসলিম ব্রাদারহুড) একজন বিশিষ্ট নেতা হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত, যদিও তাঁর কাজের পরিধি শুধু ইখওয়ানের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়।

শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযামকে (রহিমাহুল্লাহ) একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি কার মাধ্যমে জিহাদের পথে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। উত্তরে সাইয়িদ কুতুবের কথা বলেন তিনি। একজন মানুষের চিন্তা, লেখনী, কাজকর্ম কীভাবে বিশ্বে এত সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা বোঝার জন্য সাইয়িদ কুতুবের জীবনী আলোচনা খুবই জরুরি।

দূরদর্শী পিতামাতা

সাইয়িদ কুতুব শহীদ (রহিমাহুল্লাহ) ১৯০৬ সালে মিশরের মুশায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা কি ভারত থেকে এসেছিলেন নাকি মিশরীয় ছিলেন, তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে পরিবারটি মিশরে বেশ সম্ভ্রান্ত। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অনেক সম্পদের মালিক হলেও ধীরে ধীরে তা কমে আসে। কিন্তু তারপরও যথেষ্ট প্রভাবশালী রয়ে যায় পরিবারটি।

সাইয়িদ কুতুবের পিতা সমাজে যথেষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। রাজনৈতিক মহলেও

পরিচিত। রাজনৈতিক বহু সমস্যার সমাধান দিতেন তিনি। আর ধার্মিকতা তো ছিলই। তাঁর পরিবারও দ্বীনদার। তিনি পাঁচওয়াক্ত সালাতে সাইয়িদ কুতুবকে মাসজিদে নিয়ে যেতেন। সেসময় হাজ্জ করা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল। কিন্তু সাইয়িদ কুতুবের পিতা সেসময়ও হাজ্জ করেন। কুতুব তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা সম্পর্কে বলেন,

> "আমি যখন একেবারে ছোট্ট, তখন থেকেই বাবা আমার মনমস্তিষ্কে কিয়ামাত দিবসের ভয় বদ্ধমূল করে দিয়েছেন।"

'তাফসীর ফি যিলালিল কুরআনিল কারীম' ও 'নাশিদুল কুরআন' বই দুটিতে এর প্রমাণ স্পষ্ট। কিয়ামাত সংক্রান্ত আয়াতসমূহে সাইয়িদ কুতুবের দেওয়া ব্যাখা দেখলেই বুঝা যায় যে, পিতার দেখানো সেই ভয়ের কতটা প্রভাব ছিল তাঁর জীবনে!

সাইয়িদ কুতুবের মাতাও মহীয়সী সম্ভ্রান্ত নারী এবং সাচ্চা মুমিনা। তাঁর দুই ভাই (অর্থাৎ সাইয়িদ কুতুবের দুই মামা) ছিলেন আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। তাঁরাও সম্ভ্রান্ত এবং ধার্মিক।

কুতুবের মা নিয়মিত দান সাদাকাহ করতেন। যে সকল শ্রমিক তাঁদের জমিতে কাজ করত, তাদেরকেও। সবসময়ই কুরআনের তিলাওয়াত শুনতেন তিনি। জমিতে শ্রমিকদের কাজ তদারক করার সময়ও রেডিওতে কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত শুনতেন। এর প্রভাব সরাসরি পড়েছে সাইয়িদ কুতুবের ব্যক্তিত্বে।

সুযোগ্য ভাইবোন

সাইয়িদ কুতুবের ভাইবোনদের দেখলেই বোঝা যায় তাঁদের পুরো পরিবার কেমন ছিল। তাঁর ছিল তিন বোন এবং আরও একজন ভাই। সবার বড়বোনের নাম নাফিসা। নাফিসার দুই সন্তান রিফআত এবং আজমা। কুতুবের মতো এই তিনজনও প্রচণ্ড নির্যাতিত হয়েছেন যালিমের কারাগারে। রিফআতকে কুতুবের সামনেই শহীদ করা হয়। আজমাকেও প্রায়ই মেরেই ফেলা হচ্ছিল।

আরেক বোন আমিনার সাথে একজন ইখওয়ান-সদস্যের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। পাত্র কিন্তু তখন কারাগারে। তিনি আমিনাকে বলেছিলেন, "দেখো! আমি লম্বা সময় কারাগারে থাকব। তুমি অন্যত্র বিয়ে করে নাও।" উলটো আমিনাই তাঁকে জোর

বলেন, "না। আপনি কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পর আপনাকেই বিয়ে করব।" পরবর্তীতে আমিনার পঞ্চাশ বছর বয়সে ঐ ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয় তাঁর। কিন্তু আমিনার স্বামীকে মিশরের স্বৈরশাসক আনওয়ার সাদাত নির্যাতন করে হত্যা করে।

সাইয়িদ কুতুবের অপর ভাই মুহাম্মাদ কুতুব এখনও জীবিত আছেন। সৌদি আরবে বসবাস করেন তিনি। তিনিও ভাইয়ের সাথে দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ ছিলেন। নির্যাতন করে প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে দেয়া হয়েছিল তাঁকেও।

ইখওয়ানের যেসকল নেতাকর্মী মিশর সরকারের রোষানলে পতিত হয়ে কারাগারে যেতেন, তাঁদের স্ত্রী-পুত্র, পরিবার পরিজনের দেখাশোনা করতেন অপর বোন হামিদা। সাইয়িদ কুতুব অবরুদ্ধ থাকাকালীন তাঁর পক্ষ থেকে বিভিন্ন নির্দেশনা ইখওয়ানের অন্যান্য কর্মীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজও হামিদাই করতেন। অবশেষে ১৯৯৫ সালে তাঁকেও গ্রেফতার করে তাঁর ভাইয়ের সাথে দশবছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

শান্ত-সৌম্য বিপ্লবী

সাইয়িদ কুতুব শহীদের (রহিমাহুল্লাহ) ক্ষুরধার লেখনী ও শক্তিশালী চিন্তা পড়ে যে কারও মনে হতে পারে তিনি দেখতে শুনতে বেশ বড়সড় হবেন। জ্বলজ্বলে গায়ের রঙ, বিশালদেহী বিপ্লবী, বাজখাঁই কণ্ঠ। যেহেতু তাঁর লেখনী আক্রমণাত্মক, তাঁর ভাবভঙ্গিমাও হয়ত আক্রমণাত্মক। বাস্তবে তা নয়। একব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে এসে বলেছিল, "আমি ভাবতাম সাইয়িদ কুতুবকে একহাজার লোকের মধ্যেও আলাদা করে চিনে নেওয়া যাবে। আসলে দেখি উলটো!"

বাদামি রঙা ত্বক। মাঝারি উচ্চতা। দুর্বল শারীরিক গঠন। অসুস্থতার কারণে শৈশব থেকেই দুবলা পাতলা ছিলেন সাইয়িদ কুতুব। কারাগারে থেকে আরও দুর্বল হয়ে যান। ছবি দেখলেই বোঝা যায়, কতটা পলকা লোক ছিলেন তিনি। মানুষের সাথে খুবই শান্তভাবপূর্ণ হয়ে কথা বলতেন। অগ্নিঝরা বিপ্লবী সাজতেন না। এখান থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি কোন ধরণের তারবিয়াহ তাঁর পরিবারে পেয়েছিলেন।

শৈশবের জ্ঞানপিপাসা

একবার এক ঘটনা ঘটলো। সাইয়িদ কুতুব যে স্কুলে পড়াশোনা করতেন, সেখানকার কুরআন-শিক্ষকের সাথে স্কুল কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য হয়। স্কুল ছেড়ে চলে যান তিনি। প্রতিষ্ঠা করেন নিজস্ব হিফযুল কুরআন মাদরাসা। সাইয়িদ কুতুবের পিতা ওই শিক্ষকের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, ছেলেকে তার মাদরাসায় দেবেন। তখন সেই মাদরাসা এবং স্কুলের মধ্যে চলত হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা। ওই মাদরাসায় পাঠানো হলো কুতুবকে।

কিন্তু তিনি সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, সেখানে পড়াশোনা ভালো হচ্ছে না। শিক্ষকের পাঠদান ভালো না। ছাত্ররা এদিকসেদিক ঘোরাফেরা, গল্পগুজব, খেলাধুলা করে। মোটকথা, আশানুরূপ দীক্ষা তিনি পাচ্ছিলেন না সেখান থেকে। এসব দেখে তিনি মনঃক্ষুন্ন হয়ে তিনি আগের স্কুলে ফেরত আসেন।

তখন মাদরাসার হিফয বিভাগের ছাত্র-শিক্ষক সকলেই স্কুলকে ব্যঙ্গ করে বলতে লাগল, “তারা কী কুরআন শেখাবে! তারা তো কুরআন সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমরা আমাদের ছাত্রদের যথাযথভাবে কুরআন শেখাই, মুখস্থ করাই। আমরা ওদের চেয়ে ভালো।”

এসব দেখে সাইয়িদ কুতুব বালক বয়সে কুরআন মুখস্থ করার চ্যালেঞ্জ অনুভব করেন। ভাবলেন, “আমি এই মাদরাসার লোকদের দেখিয়ে দেবো যে, স্কুলে পড়লেও আমি কুরআন মুখস্থ করতে সক্ষম।”

আটবছর বয়স থেকে কুরআন মুখস্থ করতে শুরু করলেন তিনি। রাত বারোটা পর্যন্তও জেগে জেগে সবক নিতেন। বছরে ১০ পারা করে এগারো বছর বয়সেই তিনি সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করে ফেলেন।

বালকবয়সী কুতুব ওঠাবসা করতেন আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের মজলিসে। একবার এক শাইখ সূরা কাহফের তাফসীর করছিলেন। পড়তে পড়তে এলেন এই আয়াতে,

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا

আয়াতের 'نبغ' শব্দটার মূল বানান نبغي। কিন্তু আয়াতে নুন ও গাইন আছে, ইয়া নেই। সাইয়িদ কুতুব প্রশ্ন করে বসলেন, "এখানে ইয়া বাদ গেল কেন?"

শাইখ জবাব দিলেন, "তিলাওয়াতের সহজার্থে।"

এই ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো, বালক বয়সেই সাইয়িদ কুতুব শহীদ কতটা সূক্ষ্ম জ্ঞান রাখতেন, তা বোঝানো।

সাইয়িদ কুতুব ছিলেন বইয়ের পোকা। যেখানে যা টাকা পেতেন, পকেট খরচ সহ সব টাকা জমিয়ে রাখতেন। জমানো টাকায় বই কিনতেন। তাঁদের গ্রামে এক বইওয়ালা লোক আসতো, নাম সালিহ। কুতুব তাকে ডাকতেন সালিহ চাচা। তিনি এই লোকের বাঁধা ক্রেতা। কখনো কখনো দেখা যেত কোনো বই পছন্দ হয়েছে, কিন্তু টাকা শেষ। তখন সালিহ চাচা ভাড়া দিতে চাইতেন। কুতুব বলতেন, "না। ভাড়ায় নেবো না। বাকিতে দিয়ে দিন। পরেরবার এলে আমি আপনাকে টাকা দিয়ে দেবো।"

বই কেনাটা এখনকার মতো তখন তত সহাজ্জ ছিল না। বই, খাতা, কলম সবকিছুর দাম ছিল বেশি। লেখাপড়াও ব্যয়বহুল ব্যাপার। ১২ বছর বয়সী সাইয়িদ কুতুব সেই সময় নিজের টাকায় কেনা ২৫ টি বইয়ের মালিক ছিলেন। এখনই বা কয়জন কিশোর আছে, যারা নিজের টাকায় ২৫ টি বই কিনেছে? প্রাপ্তবয়স্কই বা কয়জন আছে এমন?

অনেক লোক, বিশেষত মহিলা ও শিশুরা মাসজিদে বসে ইলম শেখার সুযোগ পেতো না। সাইয়িদ কুতুব আল আজহারের আলিমগণের থেকে যা শিখতেন, ফিরে এসে তাদেরকে শেখাতেন সেসব। বড় হওয়ার পর অবশ্য আর গাইর মাহরাম মহিলাদের বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ থাকেনি।

১৯১৯ সালে সাইয়িদ কুতুবের বয়স যখন তের বছর, তখন থেকেই তাঁদের ঘর বিপ্লবীদের গোপন মিটিংয়ের জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কুতুবের দায়িত্ব ছিল, বৈঠকের সারাংশ গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। বিপ্লবের খবর জানিয়ে দেওয়া।

প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষা

সাইয়িদ কুতুব শহীদ (রহিমাহুল্লাহ) পরবর্তীতে মুশা শহর থেকে কায়রোতে চলে আসেন। কারণ তাদের সম্পদ দিনদিন কমে আসছিল। ছেলেমেয়ের পেছনে অতিরিক্ত খরচ করতেন তাঁর পিতা। তাঁদের জমিজমাও বিক্রি করে দিতে হচ্ছিল এ কারণে। ভাড়া নিতে হয়েছিল নতুন বাসা। তাই কুতুবের মা তাঁকে কায়রো গিয়ে আয়-উপার্জন করতে বলেন।

১৯২৪ সালে শিক্ষকতায় ডিপ্লোমা করলেন সাইয়িদ কুতুব। কিন্তু তিনি এতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর আকাঙ্ক্ষা উচ্চশিক্ষা। তাই তিনি 'দারুল উলুম কায়রো'তে যেতে চাইলেন। দারুল উলুম ছিল কায়রোর অন্যতম প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু সেখানে ভর্তি হতে হলে আগে চার বছরের প্রিপারেটরি কোর্স করতে হয়। সাইয়িদ কুতুব তা-ই করলেন। সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হন ১৯২৯ সালে। ভর্তি হন দারুল উলুমে।

১৯৩৩ সালে সাইয়িদ কুতুব সেখান থেকে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন। তাঁর ডিগ্রী ছিল আরবী ভাষা ও সাহিত্যে। কিন্তু এর পাশাপাশি সেই বিভাগেরই অন্তর্গত আরও অনেক বিষয় পড়তে হয়েছিল। শারীয়াহ, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, ইতিহাস, রাজনৈতিক অর্থনীতিসহ আরও অনেক বিষয়। অনেকেই বলে, সাইয়িদ কুতুব আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র, তিনি শারীয়াহ পড়েননি তাই এ সংক্রান্ত জ্ঞান তাঁর নেই। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ। তারা জানেই না সাইয়িদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহ কী পড়েছেন। কারণ, দারুল উলুম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল উচ্চশিক্ষার জন্য বহুল আরাধ্য স্থান। তারা শারীয়াহ ভালো করেই পড়ায়।

কর্মজীবনের সূচনা

১৯৩৩ সালে স্নাতক সম্পন্ন করার পর সাইয়িদ কুতুব শহীদ (রহিমাহুল্লাহ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি পান। ১৯৪০ সালে তিনি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সম্পাদক এবং অনুবাদক। এর চার বছর পর তাঁকে সেই পদ থেকে বদলি করে স্কুল ইনস্পেকটর বানানো হয়। কারণ, তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কর্তৃপক্ষের পছন্দ ছিল না। তাঁর শিক্ষাবিষয়ক লেখালেখি ভালো লাগত না তাদের। এরপর ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০

পর্যন্ত স্কুল ইনস্পেকটর ছিলেন তিনি।

এরপর আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠদান বিষয়ে অধ্যয়ন করার জন্য আমেরিকা পাঠানো হয় তাঁকে। ১৯৫০ সালে তিনি আমেরিকা থেকে ফিরে আসামাত্রই শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে পদত্যাগ করেন। এর কারণ, তাঁর চিন্তাধারার সাথে তাদের চিন্তাধারা এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পার্থক্য।

মানসিক জাহিলি যুগে

সাইয়িদ কুতুব শহীদ (রহিমাহুল্লাহ) একটা সুষ্ঠু পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েও মাঝপথে জাহিলিয়াতে ডুবে গিয়েছিলেন ছিলেন। ১৯২৫ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত ছিল এর মানসিক জাহিলি যুগের ব্যাপ্তি। অর্থাৎ, দারুল উলুম কায়রোতে উচ্চশিক্ষা অর্জনের সময়টুকু। সেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে পড়তে পড়তে বস্তুবাদের কুনীতি তত্ত্ব তাঁর অন্তরে ইসলাম সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। এই অভিজ্ঞতা তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা অর্জনকারী অসংখ্য মুসলিম তরুণের রয়েছে। দ্বীনের পথে প্রত্যাবর্তনের জন্য সাইয়িদ কুতুবের জীবনী হতে পারে তাদের জন্য আলোর দিশা।

মনের মধ্যে নিজের সাথে বিদ্রোহ করে দিন কাটাচ্ছিলেন সাইয়িদ কুতুব। তিনি সবসময়ই একটা জিনিস জানতে উদগ্রীব হয়ে ছিলেন, তা হলো জীবনের রহস্য। কেন এই জীবন? কেনই বা মরে যাওয়া? কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাব? এসব ভেবে প্রায়ই চিৎকার করে করে কাঁদতে থাকতেন তিনি। মরে যেতে চাইতেন। যেন মৃত্যু তাঁকে এই মানসিক সংঘাত থেকে দূরে নিয়ে যায়। নিরিশ্বরবাদী ও শূন্যবাদী ধ্যানধারণায় নিমজ্জিত প্রতিটি তরুণ-যুবার মানসিক চিত্র এরকমই।

তাঁর মনের এই অবস্থা চলাকালে তিনি অনেকগুলো কবিতাও লিখেছিলেন। 'আশ-শাতিউল মাজহুল' (অজানা উপকূল) নামে সংকলিত হয়েছে এগুলো। তিনি তাঁর নিজের এই অবস্থা পরবর্তীতে এভাবে ব্যাখা করেছিলেন যে, তিনি যেন এক উপকূলে দাঁড়িয়ে আছেন। সাগরের সন্ধান করছেন কিন্তু পাচ্ছেন না। কেমন তার বিশালতা? সে সাগরের নামটাই বা কী?

সাইয়িদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহ তাঁর এই মানসিক সংঘাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন। কিন্তু কীভাবে তিনি ইসলামপন্থী ব্যক্তিত্বে পরিনত হলেন? ইসলাম

কীভাবে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো?

জাহিলিয়্যাতের সমাপ্তি

সাইয়িদ কুতুব শহীদ (রহিমাহুল্লাহ) যখন দ্বীনের পুনঃসন্ধান পান, তখন এই দ্বীন তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। সন্দেহ, সংশয় ও অবিশ্বাসের দুনিয়া থেকে ঈমান, ইসলাম, দ্বীন, দাওয়াহ ও জিহাদের দুনিয়ায় ফিরে এলেন তিনি। পরিণত হলেন এক নতুন মানুষে। তিনি বলেন, "আমি যেন নতুন করে জন্ম নিলাম।"

জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া কিছু ঘটনা ঘটে তাঁর সাথে।

প্রথমটি আমেরিকায় যাওয়ার পথে। জাহাজে অবস্থানকালে হঠাৎ বড় বড় ঢেউ আসে। ঢেউয়ের ধাক্কায় কাপতে থাকে জাহাজ। ঠিক সেই মুহূর্তে কুতুব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কুদরতের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, "ঠিক তখনই আমার বুকে ঈমানের শক্তি বদ্ধমূল হয়ে যায়।"

দ্বিতীয় ঘটনাটি আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোতে অবস্থানকালে। সাইয়িদ কুতুব বলেন, সেখানে তিনি এক উঁচু পাহাড়ে চড়েন একবার। পাহাড়ের উচ্চতা থেকে প্রত্যক্ষ করেন সৃষ্টিজগত। আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট দুনিয়ার সৌন্দর্য ও আশ্চর্যময়তা দেখে চমৎকৃত হয়ে পড়েন। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিতে ও মহাবিশ্বে খুঁজে পান আল্লাহ তাআলার নিদর্শন। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর হৃদয়াভ্যন্তরে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সজোরে ধাক্কা দেয়। এতেই তিনি ফিরে পান চৈতন্য।

এই দুই ঘটনার পরই তিনি কুরআনকে তাঁর জীবনের পথনির্দেশিকা হিসেবে গ্রহণ করে নেন। এবারে তিনি কুরআনুল কারীমকে সকল বাহ্যিক ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত রেখে আক্ষরিকভাবে অধ্যয়ন করা শুরু করেন। তাঁর মাতৃভাষা আরবীই। এরপরেও কুরআনুল কারীমকে কুরআনের আবেদনে বুঝতে ও পড়তে শুরু করেন তিনি। জীবনের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে কুরআনুল কারীমকে সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করেন। সৃষ্টির সাথে জীবনের সাদৃশ্য খুঁজতে ব্যবহার করেন কুরআনুল কারীমের উদাহরণ। এরপর ধীরে ধীরে অধ্যয়ন করেন ইসলামের মৌলিক নীতিমালা।

পরিবর্তনের তিনটি ধাপ

সাইয়িদ কুতুব শহীদের (রহিমাহুল্লাহ) ইসলামপন্থী হওয়ার প্রক্রিয়াটি বুঝতে হলে আমরা তাঁর জীবনকে তিনভাগে ভাগ করতে পারি।

প্রথমত, তিনি কুরআন অধ্যয়নকে কেন্দ্র করে 'নিউ কুরআন লাইব্রেরি প্রজেক্ট' চালু করেন। শাইখ আলি তানতাভী (রহিমাহুল্লাহ) সাইয়িদ কুতুব শহীদ সম্পর্কে বলেছিলেন, "আল্লাহ তাআলা সাইয়িদ কুতুবকে কুরআন বোঝার যে মেধা দান করেছেন, কুরআনের সৌন্দর্যের ধনভাণ্ডার খোলার যে চাবি দান করেছেন, তা আর কাউকেই দান করেননি।"

সাইয়িদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহকে কুরআন কীভাবে আসক্ত করেছে সেসম্পর্কে তিনি নিজে বলেছেন,

الحياة في ظلال القرآن نعمة. نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها. نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه.

والحمد لله. لقد منّ علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان، ذقت فيها من نعمته ما لم أذق قط في حياتي. ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه

"কুরআনুল কারীমের ছায়াতলে জীবনযাপন এমন এক নিয়ামাত, এর আস্বাদক ব্যতীত কেউই এর স্বরূপ জানে না। এটি জীবন বৃদ্ধি করে, জীবনে আনে বারাকাহ'র ফল্গুধারা এবং পরিশুদ্ধ করে তোলে মানবজীবন। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাকে জীবনের অল্প সময় হলেও কুরআনুল কারীমের ছায়াতলে থাকার অনুগ্রহ দান করেছেন।"[৭৩]

দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি কুরআনুল কারীমের শিক্ষা দিয়ে কমিউনিজম ও ক্যাপিটালিজম মতাদর্শদ্বয়কে খণ্ডন করা শুরু করেন। এ সমস্ত মতবাদ মিশরীয় সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল তখন। সাইয়িদ কুতুব এসবের খণ্ডনে প্রচুর বইপত্র লিখেন। সেসময়কার

[৭৩] তাফসীর ফি যিলালিল কুরআনিল কারিমের ভূমিকায় সাইয়িদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহর এই অনুভূতি তিনি লিখেছেন।

লেখা তাঁর একটি প্রসিদ্ধ বইয়ের নাম হলো, 'আল আদালতুল ইজতিমাইয়্যাহ ফিল ইসলাম' যা ইংরেজিতে *'Social Justice in Islam'* নামে অনূদিত হয়েছে।

সাইয়িদ কুতুবের জীবনের তৃতীয় মোড়টি ছিল, ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ ও ব্যাপক জীবনঘনিষ্ঠ আন্দোলন হিসেবে অনুধাবন। এমন এক আন্দোলন, যা জীবনের সর্বস্তর ক্ষেত্রে প্রয়োজন।

সাইয়িদ কুতুব মানুষের ওপর আল্লাহ তাআলার দেওয়া দায়িত্বের বাস্তবতা বুঝতে পেরেছিলেন। আরও বুঝতে পেরেছিলেন সমগ্র মানবজাতির ওপর উম্মাতে মুহাম্মাদির সাক্ষী হওয়ার বাস্তবতাটিও।

ইসলামের প্রচারকার্যে নেমে সাইয়িদ কুতুব বুঝতে পারলেন যে, তাঁর দায়িত্ব কুরআনুল কারীমে বলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর নিজের জীবন কীভাবে পরিচালনা করতে হবে, কুরআনুল কারীমে আছে তার ম্যানিফেস্টো।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

সাইয়িদ কুতুব শহীদ (রহিমাহুল্লাহ) ১৯৪২ সাল পর্যন্ত আল হিযব নামের একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তারপর তা ছেড়ে দিয়ে তৈরি করেন হিল্লুস সায়িদিন নামে আরেকটি সংগঠন। কিন্তু ১৯৪৫ সালে তিনি সকল রাজনৈতিক দল ছেড়ে দেন। প্রত্যাহার করে নেন সব ধরনের সক্রিয়তা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। অন্যদেরকেও ছেড়ে দিতে বলেন। তিনি বললেন, "এইসব রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থ গোছাতে ব্যস্ত। তারা জনগণের জন্য কিছুই করে না।"

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এরা কুতুবের গভীর উদ্দীপনা, কর্মময় জীবন ও শক্তিব্যয়ের যোগ্য স্থান নয়। তিনি সেসময়কার যাবতীয় রাজনৈতিক দলের ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে একাই লড়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রকাশ করেন লেখনী, বক্তৃতা ও ম্যাগাজিন। ১৯৫৩ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমীনে যোগ দেয়ার আগপর্যন্ত এসব কার্যক্রম চালিয়ে যান তিনি।

ইখওয়ানুল মুসলিমীন

১৯৫২ সালে মিশরে একটি বিপ্লব হয়। এই বিপ্লবের পর মিশরের শাসক হয়ে যায় অত্যাচারী জামাল আবদেন নাসের। কীভাবে বিপ্লবটি হলো, কীভাবে জামাল আবদেন নাসের মিশরের শাসক হলো, তা বুঝতে হলে আমাদেরকে সাইয়িদ কুতুব শহীদ (রহিমাহুল্লাহ) ও তাঁর দল ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আন্দোলনকে বুঝতে হবে।

ইখওয়ানুল মুসলিমীনের পরিকল্পনা ছিল তারা একটি বিপ্লব করবে। বিপ্লবের সুবিধার্থে তারা পরিকল্পনা করেছিল, সেনাবাহিনীর মাঝে নিজেদের চিন্তা ও মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার। তাদেরকে ইখওয়ানে এনে দেওয়া হবে বিভিন্ন পদ। কিন্তু সেনাবাহিনীর এই অফিসাররা সরাসরি ইখওয়ানের সাথে যুক্ত হবে না। হবে ইখওয়ানেরই একটা গোপন সামরিক শাখা—নিজামুল খাস।

সেসময় মাহমুদ লাবিব নামে ইখওয়ানের এক দায়িত্বশীল ছিলেন। সেনাবাহিনীর যেসকল অফিসার ইখওয়ানের পদে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া ছিল তাঁর কাজ। ইখওয়ান ততদিনে নিজেদের চিন্তা সেনাবাহিনীতে সফলভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে। এসকল অফিসারের মধ্যে দুজন ব্যক্তি ইখওয়ানের গোপন সংগঠনে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল। একজন জেনারেল জামাল আবদেন নাসের, অপরজন আবদুর রঊফ। এদের মাঝেও জামাল আবদেন নাসেরের সক্রিয়তা ও প্রভাব বেশি। জেনারেল জামাল আবদেন নাসের সহ অফিসারদের পুরো দলটি 'নিজামুল খাস'এর প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেয় ১৯৪৬ সালে। এর আরেক নাম অফিসার্স ক্লাব। এই দলের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা হতো।

১৯৪৯ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল বান্নাকে (রহিমাহুল্লাহ) হত্যা করে মিশর সরকার। অফিসার্স ক্লাবের সকলে মিলে এক বৈঠকে এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। করা হয় সরকার উৎখাতের গোপন পরিকল্পনা। জামাল আবদেন নাসের নিজেও ছিল সেখানে। পাশাপাশি তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সাধারণ নাগরিকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনা করে। সে পরিকল্পনাও গোপন। এমনকি নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবে তারা নিজেদের দলের নাম 'ইখওয়ান অফিসার্স ক্লাব' থেকে পরিবর্তন করে 'আদ দুব্বাত আল আহরার' (ফ্রি অফিসার্স' ক্লাব) নামকরণ করে।

কিন্তু এরপর একটা ব্যাপার ঘটলো। জামাল আবদেন নাসের এবং আবদুর রউফের মধ্যে ছিল প্রচুর মতানৈক্য ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। জামাল আবদেন নাসের চাইতো ইখওয়ানী মতাদর্শের বাইরের অফিসারদেরও সংগঠনে যুক্ত করতে। তারা দ্বীনদার মুসলিম হোক বা না হোক। আবদুর রউফের অবস্থান একেবারেই বিপরীত। তাঁর কথা ছিল, কোনো অমুসলিম কিংবা ধর্মবিরাগী মুসলিম ইখওয়ান বিপ্লবের অংশ হতে পারে না।

মাহমুদ লাবিব এইসময়ে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৃত্যুশয্যায় তিনি চাচ্ছিলেন, কাউকে গোপন সংগঠনের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে। আদ দুব্বাতুল আহরারের সমুদয় অর্থ ও তথ্য দিয়ে দেওয়ার জন্য নির্ভরযোগ্য কাউকে চাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না। আবদুর রউফ অন্য কোথাও সফরে ছিলেন এসময়। মিশরে মাহমুদ লাবিবের আশেপাশে ছিল শুধু জামাল আবদেন নাসের। মাহমুদ লাবিব তাকেই দিয়ে দেন গোপন শাখার সমস্ত তথ্য, সমুদয় অর্থ, সদস্যদের নাম ঠিকানা।

নাসেরের বিশ্বাসঘাতকতা

সাইয়িদ কুতুব শহীদ (রহিমাহুল্লাহ) এই বিপ্লবের সময়ে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্য ছিলেন না। সদস্য না হয়েও তিনি আর আট দশজনের মতোই জামাল আবদেন নাসেরকে ভাবতেন ভালো লোক। তখন সাইয়িদ কুতুব নিজেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। মাসে মাসে ম্যাগাজিন প্রকাশ করছিলেন, নিয়মিত পত্রিকায় লিখছিলেন ভারী ভারী কলাম। সেনাবাহিনীর অফিসাররা ইখওয়ানে যোগ দেওয়ার মূল কারণ এসকল লেখালেখি। তারা সাইয়িদ কুতুবের এসব প্রবন্ধ, কলামে বেশ প্রভাবিত হতেন। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কেন্দ্র থেকেই তাদেরকে উৎসাহিত করা হতো এসব কলাম পড়তে। ঠিক সেসময় জামাল আবদেন নাসেরসহ গোপন শাখার আরও বেশকিছু অফিসার সাইয়িদ কুতুবের বাড়িতে বিপ্লবের পরিকল্পনা করতে যায়। সাইয়িদ কুতুব শহীদ ছিলেন সেসময়ের মিশর বিপ্লবের থিংক ট্যাংক। বিপ্লবে অংশ নেয়া সকলের তাত্ত্বিক গুরু। সকল পরিকল্পনা, চিন্তাধারার যোগান তিনিই দিতেন।

১৯৫০ সালে জামাল আবদেন নাসের ফ্রি অফিসার্স ক্লাব ছেড়ে দেয়। তারপর সে নিজেই আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে যুক্ত করা শুরু করে সেনাবাহিনীর অন্যান্য অফিসারকে। ইখওয়ানের সামরিক শাখার সাথে শুরু হয় তার বিরোধ।

এদিকে জামাল আবদেন নাসের গোপন সামরিক শাখা ছেড়ে দিলেও ইখওয়ানুল মুসলিমীনের দাওয়াহ শাখার সাথে যোগাযোগ বজায় রাখে। দাওয়াহ শাখা ও গোপন সামরিক শাখার মধ্যে যোগাযোগ ছিল একেবারেই সীমিত ও খুবই গোপন। কারণ, দুই শাখার যোগাযোগের কথা প্রকাশ পাওয়া মানেই সমূহ বিপদ। জামাল এই যোগাযোগ দুর্বলতাকে কাজে লাগায়। দাওয়াহ শাখার কাছে খুবই দায়িত্বশীলতা দেখাতো সে।

সেসময় দাওয়াহ শাখা পরিচালিত হতো হাসান হুদাইবির অধীনে। জামাল আবদেন নাসের ইখওয়ানের দাওয়াহ শাখাকে খুব করে প্রতিশ্রুতি দিলো যে, সে ক্ষমতায় গেলে পরিপূর্ণ শরীয়াহ চালু করবে। ইখওয়ানকে সহযোগিতা করবে। ক্ষমতায় গেলে ইখওয়ানের প্রতি আনুগত্যের শর্তে জামাল আবদেন নাসেরকে সাহায্য করতে রাজী হয় ইখওয়ানুল মুসলিমীন। সামরিক শাখার সাথে জামালের দ্বন্দ্বের কিছুই জানতেন না তারা।

জামাল আবদেন নাসের ইখওয়ানের সমর্থন ও পূর্ণ সহযোগিতায় ক্ষমতার চূড়ান্তে পৌঁছে যায়। এরপর তার সাথে দেখা করতে আসেন হাসান হুদাইবি। মনে করিয়ে দেন পূর্বের সব শর্ত, শরীয়াহ চালু করার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু জামাল প্রত্যেকটা শর্ত প্রত্যাখান করে! শরীয়াহ বাস্তবায়ন তো দূরের কথা, এমন ভাব করল যেন সে ইখওয়ানকে চেনেই না

এরপর হাসান হুদাইবি আর কীইবা করতে পারেন? জামাল এখন ক্ষমতায়। সেনাবাহিনী তার সাথে। তাই তিনি শেষমেশ বললেন, "আমরা তোমাকে সংস্কারক মনে করি। তোমার মধ্যে ভালো গুণ আছে। তুমি যদি ভালো কাজ করো, জনগণের জন্য কাজ করো, তবে আমরা তোমাকে নাসীহাহ করব। আর ভুল করলে সহযোগী হিসেবে শুধরে দেবো।"

নাসেরের সাথে কুতুবের সাক্ষাৎ

বিপ্লবের পর সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ (রহিমাহুল্লাহ) জামাল আবদেন নাসের সহ অন্যান্য অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। জামাল তখনও তার কুৎসিত রূপ প্রকাশ করেনি। কখনো কখনো দিনের বারো ঘন্টাই তাদের সাথে সাক্ষাতে কাটাতেন কুতুব। কীভাবে বিপ্লবকে সফল করা যায়, সে পরিকল্পনার ছক কষতেন। উল্লেখ্য,

তখনও কিন্তু সাইয়িদ কুতুব নন। তবুও তিনি জামাল আবদেন নাসেরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতেন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে।

এদিকে জামাল আবদেন নাসের 'জাবহাতুত তাহরির' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এটির আসল উদ্দেশ্যই ছিল ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কাজে বাগড়া দেওয়া। দাওয়াহর ময়দানে তখন ইখওয়ানের একচ্ছত্র আধিপত্য। তাই সে চাচ্ছিল আরেকটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তাদের প্রভাব খর্ব করতে।

সাইয়িদ কুতুব এই পরিকল্পনা জানতেন না। তিনি তা বুঝতে পারেননি। এমনকি তিনি জামাল আবদেন নাসেরকে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতাও করেন। কিন্তু একমাসের মাথায় তিনি ধরে ফেললেন জামালের চালাকি। সাথে সাথে পদত্যাগ করেন এই দল থেকে। জামাল আবদেন নাসের বহু চেষ্টা করল, কুতুবকে বুঝিয়ে বলে কয়ে আবার সংগঠনে ফিরিয়ে আনতে। দেওয়া হলো অনেক লোভনীয় পদের প্রস্তাবও। কুতুব সেগুলো নির্দ্বিধায় প্রত্যাখান করেন।

ইখওয়ান ও সাইয়িদ কুতুব

সাইয়িদ কুতুব শহীদ (রহিমাহুল্লাহ) ব্যক্তিগতভাবে হাসান আল বান্নার (রহিমাহুল্লাহ) সাক্ষাৎ পাননি কখনও। তাদের সরাসরি সাক্ষাৎ হওয়ার ব্যাপারে প্রচলিত ধারণাটি সত্য নয়। তিনি ১৯৪৮ সালে আমেরিকা যাওয়ার আগে হাসান আল বান্নার কাজ ও চিন্তাধারা সম্পর্কে জানতেন মাত্র।

কুতুব আমেরিকায় অবস্থানকালে ফিলিস্তিনের যুদ্ধে বহু ইখওয়ানী অংশগ্রহণ করে। তারা ফিরে এলে সবাইকে গ্রেফতার করে জেলে পুরে দেয় মিশর সরকার। তখন সাইয়িদ কুতুব 'আল আদালাতুল ইজতিমাইয়্যাহ'(দ্য সোশ্যাল জাস্টিস ইন ইসলাম) লিখেছেন। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে অনেক কথা আছে এই বইয়ে। তা পড়ে বহু ইখওয়ানী ভাবলো এই বই বুঝি তাদের জন্যই লেখা! এমনকি কারাগারে পর্যন্ত সবার হাতে হাতে চলে গেল বইটি। অথচ সাইয়িদ কুতুব তখনও ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কেউই নন। এ সময় 'আল আদালাতুল ইজতিমাইয়্যাহ' বইয়ের এক কপি ইমাম হাসান আল বান্নাকে দেওয়া হলে তিনি তা পড়ে বললেন,

هذه أفكارنا وينبغي أن يكون هو أحدًا منا

"এসব তো আমাদেরই কথা। আমাদেরই মতাদর্শ। এই বই যিনি লিখেছেন, তাঁর তো আমাদের একজন হওয়া উচিৎ।"

এদিকে সাইয়িদ কুতুবও আমেরিকা গিয়ে জায়োনিজমের স্বরূপ টের পান। প্রত্যক্ষ করেন ইসলামের দাওয়াতের প্রতি কুফফার শক্তির তীব্র ঘৃণা বিদ্বেষ। বিশেষ করে ইখওয়ানী আন্দোলনের প্রতি তাদের জিঘাংসা। দুটি ঘটনা সাইয়িদ কুতুব শহীদকে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে।

প্রথমটি ছিল, ইমাম হাসান আল বান্নার (রহিমাহুল্লাহ) শাহাদাত। যখন তাঁকে হত্যা করা হয়, কুতুব তখন আমেরিকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রেডিও টেলিভিশনে শাহাদাতের খবর প্রচারিত হলে উল্লাসের ঢেউ খেলে গেল পুরো হাসপাতালে। হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, বয় সবার মধ্যেই আনন্দ। তখন সাইয়িদ কুতুব কুফফারদের মনে ইসলামের প্রতি পুষে রাখা বিদ্বেষ বুঝতে পারেন।

কুতুবের সাথে সেসময় এক ইংরেজ গোয়েন্দার যোগাযোগ ছিল। নাম জন হার্সডেন। মধ্যপ্রাচ্যে দায়িত্ব পালনের সময় ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করেছিল সে। আরবীও শিখেছিল। এমনকি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এক মুসলিম নারীকে বিয়ে করে আমেরিকা নিয়ে আসার দাবিও করে সে। সাইয়িদ কুতুবের 'আল আদালাতুল ইজতিমাইয়্যাহ' ইংরেজিতে অনুবাদ করার আগ্রহ প্রকাশ করে দশহাজার ডলার সম্মানীরও প্রস্তাব দেয়।

এভাবে নিয়মিত কথা হতো সাইয়িদ কুতুব ও হার্সডেনের। ইখওয়ান সম্পর্কেও সে বলত অনেককিছু। তার কাছে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের শুরু থেকে ইমাম হাসান আল বান্নাকে হত্যার পরিকল্পনার সকল দলিল দস্তাবেজ ছিল। ইখওয়ানের প্রতিটা ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট, প্রতিটা কর্মকাণ্ড, বক্তব্য থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রের সকল গোপন নথি জন হার্সডেনের নখদর্পণে। সে নিজেই সাইয়িদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহকে বলল, "ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধের কথা মাথা থেকে ফেলে দাও। কারণ, এটা অর্থহীন। ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে ঠিক। কিন্তু এরপরেই আমেরিকা এসে দখল করে নেবে। সুতরাং এতে কোনো ফায়দা নেই।"

জন হার্ডসেনের চালাকি দেখুন, ব্রিটিশ গোয়েন্দা হিসেবে সে চাইছিল সাইয়িদ কুতুবের মগজধোলাই করতে। তাঁকে ইখওয়ান থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। ইখওয়ানের

ব্যাপারে অনেক কুৎসাও রটায় এই লক্ষ্যে।

এসব শুনে সাইয়িদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহ জন হার্ডসেনের মনে থাকা ইখওয়ান-বিদ্বেষ টের পাচ্ছিলেন। তাই তিনি ১৯৫৩ সালে আমেরিকা থেকে ফিরেই ইখওয়ানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

সেসময় চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল জামাল আবদেন নাসেরের সাথে ইখওয়ানের দ্বন্দ্ব। নাসের সরকার তখন ইখওয়ানী পেলেই জেলে পুরছিল। ইখওয়ানকে এড়িয়ে চলছিল সকলেই। কেউ ইখওয়ানের সাথে সম্পর্ক স্বীকার করে না। সক্রিয় নেতারাও মোটামুটি ছয়মাস-একবছর ঘরে লুকিয়ে থেকে কমিয়ে ফেলছিল নিজের সক্রিয়তা। এমন কঠিন মুহূর্তে ১৯৫৩ সালে সাইয়িদ কুতুব শহীদ ইখওয়ানে যোগ দেন।

এই ঘটনা আমাদেরকে উহুদ যুদ্ধের একটি মুহূর্ত মনে করিয়ে দেয়। সে সময় এক ধনবান ইয়াহূদী ছিল, নাম মুখাইরিখ। উহুদের যুদ্ধে যখন সে দেখল, মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আহত হয়েছেন, অনেক মুসলিম শহীদ হয়ে যাচ্ছেন, তখন হঠাৎ করে মুখাইরিখের হৃদয়ে ঈমানের জোয়ার এসে যায়। ইসলাম গ্রহণ করে সে। ইসলামের জন্য তার সকল সম্পদ ব্যয় করে দেয় সে।

মুখোমুখি কুতুব ও নাসের-প্রশাসন

ইখওয়ানের এই কঠিন মুহূর্তে দলটিতে যোগ দিয়ে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা চালু করেন সাইয়িদ কুতুব শহীদ (রহিমাহুল্লাহ)। সেখানে নিয়মিত প্রবন্ধ রচনা করতে থাকেন। যেখানেই যান, যেদেশেই যান, সেখানেই ছড়িয়ে দিতে লাগলেন ইখওয়ানের মতাদর্শ। অবশেষে ১৯৫৪ সালের জানুয়ারিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ইখওয়ানুল মুসলিমীনকে। গ্রেফতার করা হলো তাদের সাথে জড়িত পরিবারগুলোকেও। সমস্ত কেন্দ্রীয় নেতাকেও কারাগারে নেয়া হয়। কিন্তু কঠিন আন্দোলনের পর তাদের সবাইকে মুক্তি দেয়া হয়।

সাইয়িদ কুতুব কারাগারে গিয়ে আরও ভালো করে বুঝতে পারলেন কার মনে কত ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ। বুঝতে পারলেন আকীদার বাস্তবতা, চিনলেন আল্লাহর দল ও শয়তানের দলের পার্থক্য।

দমিয়ে রাখা গেল না তাঁকে। এবার তিনি আরও শক্তভাষায় লেখালেখি শুরু করেন।

কাদিন প্রতিবাদী প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন নাসের প্রশাসনের বিরুদ্ধে। এ সময় জামাল আবদেল নাসেরের কানে পৌঁছল যে, ইখওয়ান তাকে হত্যার পরিকল্পনা করছে। এরপর অক্টোবরে আবারও হাজার হাজার ইখওয়ানী কর্মীকে জেলে পোরা হয়। এটা ছিল ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রথম বড় পরীক্ষা। কিন্তু এর আগেও নাসের সরকার সাইয়িদ কুতুবকে অনেক নির্যাতন করেছে। গ্রেফতারের সময় ভীষণভাবে জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। সামরিক অফিসার তাকে গ্রেফতার করে হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে দেয়। কোনো গাড়ির ব্যবস্থা না করে হেঁটে যেতে বাধ্য করে জেল পর্যন্ত। অসুস্থতার কারণে চলতে গিয়ে তিনি বার বার বেহুঁশ হয়ে পড়েন। তবুও তাঁকে পায়ে হাঁটা থেকে রেহাই দেওয়া হয়নি।

জেলে প্রবেশ করার সাথে সাথে হিংস্র জেল কর্মচারীরা তাকে নির্মমভাবে মারধর করতে থাকে। লাগাতার দুই ঘণ্টা চলতে থাকে এ অত্যাচার। অত্যাচারে আহত সাইয়িদ কুতুবের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর পা কামড়ে ধরে জেলের আঙ্গিনায় টেনে নিয়ে বেড়াতে থাকে কুকুরটি।

নির্মম অত্যাচারে অভ্যর্থনা শেষ হওয়ার পর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় একটি নির্জন কক্ষে। সেখানে একটানা সাত ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। রক্তাক্ত বেদনায় জর্জরিত শরীর এসব শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করার মতো ছিল না। আগুন দিয়ে সারা শরীর ঝলসানো, কুকুর লেলিয়ে দেওয়া, মাথার ওপর কখনো টগবগে গরম, আবার পরক্ষণেই বরফশীতল পানি ঢালা—কিছুই বাদ যায়নি।

পুলিশ লাথি, ঘুষি মেরে একদিক থেকে অন্য দিকে নিয়ে যেত তাঁকে। এমনও হয়েছে একাধারে চার দিন তাকে একই চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে, কোনো খাবার-পানীয় দেওয়া হয়নি। অথচ তাঁকে দেখিয়ে দেখিয়ে অন্যরা ফূর্তি করে পানি পান করেছে। এমনিতেই আথ্রাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস, ও বাতের ব্যথা ছিল আগে থেকে। নির্যাতনের ফলে এসব রোগ আরও বেড়ে যেত।

ট্রায়ালের জন্য নিয়ে গিয়ে তারাই তাঁকে বলত, "আপনাকে তো খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।" তিনি বলতেন, "হ্যাঁ, আমাকে ট্রায়ালের আগে ছয়ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।"

এ সকল নির্যাতনের কথা আদালতে বলাও যেত না। তাহলে নির্যাতন করা হতো আরও বেশি। কিন্তু সাইয়িদ কুতুব শহীদ (রহিমাহুল্লাহ) এসবে ভয় পেতেন না। তিনি নিজের কাপড় খুলে সরাসরি দেখাতেন তাঁর পিঠে কয়বার বেত্রাঘাত করা হয়েছে।

এরপরেও তাঁকে দেওয়া হয় ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। কিন্তু অসুস্থতার কারণে দশবছর পরেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

কারাগারে সবাই সাইয়্যিদ কুতুবকে সম্মান করত। এমনকি ভয়ংকর অপরাধীরাও সমীহের দৃষ্টিতে দেখত তাঁকে। কারারক্ষীরাও শ্রদ্ধা করত। তাদের সবার মনমস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য খাবার এলে সেই খাবার অন্য কয়েদীদের মধ্যে বিতরণ করে খেতেন।

নতুন পরিকল্পনা

সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ (রহিমাহুল্লাহ) কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর আবদুল ফাত্তাহ ইসমাঈলী নামে এক ব্যক্তি নতুন করে আবার দলটাকে গঠন করতে চাইলেন। তখনও ইখওয়ান নিষিদ্ধ। কুতুব কারাগারে থাকাকালীনই আবদুল ফাত্তাহ ইসমাঈলী এই ব্যাপারে কথা বলেন তাঁর সাথে। কুতুব এ নিয়ে বহু ভেবেছেন। পরিকল্পনা করেছেন আবার সংগঠন করা উচিৎ কি না, জামাআতের পরিচয় সামনে আনা উচিৎ কি না।

এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁকে কিছু একটা করতেই হবে। কারণ সমাজে সেক্যুলারিজম ছেয়ে যাচ্ছে। জামাআতের সাথে মানুষের পরিচয় করানো এখন সময়ের দাবি। কারাগার থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সাইয়্যিদ কুতুব। তাঁর মাথায় নতুন পরিকল্পনা এলো।

তিনি দেখলেন যে, ইসলামী দলগুলো গতানুগতিক রাজনৈতিক পর্যায়ে বেশ মনোযোগী। কিন্তু পুরো সমাজটাই গোড়া থেকে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সেদিকে কারও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। পুরো সমাজ জাহিলিয়্যাতে ভরপুর। আকীদার অনুধাবন থেকে বহুদূরে। সরকারকে উৎখাত করার আগে সমাজ থেকে ইসলাম দূর হয়ে যাওয়াটা রুখে দেওয়া প্রয়োজন। এমন একটি দলকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে তোলা প্রয়োজন, যাদের আকীদাহ হবে মজবুত। কারণ, সাইয়্যিদ কুতুব এর আগে জামাল আবদেন নাসেরের কাণ্ডকারখানা দেখেছেন। সে সরকার দখল করে ফেলেছে, শাসন ব্যবস্থা বাগিয়ে নিয়েছে অথচ সে ছিল পুরো দুর্নীতিবাজ।

তাই সাইয়্যিদ কুতুব ভাবলেন, "আমাদের আবার শুরু থেকে সব ঠিক করা উচিৎ, যেন কোনো দুর্নীতিবাজের কারণে আমাদের কাজ থেমে না যায়। কেউ যেন বাধা সৃষ্টি

করতে না পারে। আমাদের অবশ্যই উচিৎ, প্রশিক্ষিত একটি দল তৈরি করা, যারা এসব অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রতিশোধ নেবে। তারা প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে, কারাগার, পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ সবকিছুই রাখবে অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণে।" সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাইয়িদ কুতুব কারাগার থেকেই দল পরিচালনা করতে লাগলেন, নির্দেশনা দিতে লাগলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ফাঁস হয়ে যায় এই গোপন পরিকল্পনা। কারণ, ইখওয়ানের ছদ্মবেশ ধারণ করে বহু গাদ্দার আশেপাশে ছিল। জামাল সরকারের কাছে সকল তথ্য সরবরাহ করত তারা। ইখওয়ানের সর্বশেষ পরিকল্পনা ছিল বিরোধীদের প্রতিরোধ করার আগে সমাজ ঠিক করে নিতে হবে। কিন্তু হলো কী? ইখওয়ানুল মুসলিমীন টের পেলো যে, তাদের সব পরিকল্পনা বানচাল হওয়ার সম্মুখীন। ফলে তারা তড়িঘড়ি করে নিজেদের পরিকল্পনার কথা সকলকে জানিয়ে দিলো। এও বলে দিলো যে, তারা সব ধরনের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত। কিন্তু এই তথ্য তারা ইখওয়ান ছদ্মবেশি সরকারি গোয়েন্দাদেরকেও বলে ফেলল।

এমনকি এমন একটি পরিকল্পনাও হয়েছিল যে, সৌদি আরব থেকে অস্ত্র ও প্রয়োজনীয় উপকরণ আসবে। কিন্তু সাইয়িদ কুতুব শহীদ যখন বুঝতে পারলেন যে এই পরিকল্পনা সিক্রেট সার্ভিসের পক্ষ থেকে আয়োজন করে করা হচ্ছে ইখওয়ানকে ফাঁসিয়ে তাদেরকে শেষ করার জন্য, তখন তিনি প্রত্যাখান করলেন এই পরিকল্পনা।

এরপর ১৯৬৫ সালে জামাল আবদেন নাসের রাশিয়ার মস্কোতে অবস্থানকালে ঘোষণা করলো যে, গোপন সংস্থা ইখওয়ান তার সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করছে। বলাবাহুল্য, জামালের সাথে তখন কমিউনিস্টদের সাথে দহরম মহরম চলছিল মস্কোতে। তার এই ঘোষণার পর ১৯৬৫ সালে আবারও বহু ইখওয়ানীকে গ্রেফতার ও কারানির্যাতন করা হয়। এটা ছিল ইখওয়ানুল মুসলিমীনের দ্বিতীয় পরীক্ষা। এসময় সাইয়িদ কুতুবের কাছে এক জিজ্ঞাসাবাদে ইখওয়ানের গোপন পরিকল্পনা, বিদ্রোহের ছক সহ সবকিছু জানতে চাওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদকারীর সামনে সব স্বীকার করে নেন তিনি। সকল দায় নিজের কাঁধে তুলে নেন। প্রতিটা পদক্ষেপ, কাজকর্ম ও ঘটনার দায় তাঁর বলে স্বীকার করে নেন। এরপর তাঁকে নেওয়া হয় কোর্টে।

পুনরায় কারাভোগ

সাইয়িদ কুতুবকে প্রথমবার গ্রেফতারের পর দশবছর কারাগারে রাখা হয়। এরপর মুক্তি পেয়ে একবছর বাইরে থাকেন তিনি। এরপর গ্রেফতার করা হয় দ্বিতীয়বার। সেবার কোর্টে তোলার আগে তাঁর সামনেই পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয় তাঁর ভাগ্নে রিফআতকে।

ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আরেক নারী সদস্যা যাইনাব আল গাযালীও সহ্য করেছেন মারাত্মক নির্যাতন। তিনি একবার কারাগারের টয়লেটে যাওয়ার সময় এমন এক স্থান অতিক্রম করছিলেন, যেখানে কুতুবকে প্রহার করা হচ্ছিল। কাপড়ের মতো কিছু একটা দিয়ে ঢাকা ছিল জায়গাটা। যাইনাব যাওয়ার সময় বাতাসে কাপড়টা উঠে যায়। তা দেখে কারারক্ষীরা কুতুবকে বললো, “এই কাপড় তুমি যাইনাবের সাথে যোগাযোগ করতে নিজে নিজে উঠিয়েছো।” এ কথা বলে তারা আরও মারতে শুরু করে।

যাইনাব গাযালী বলেন, “টয়লেট থেকে ফেরার পথেও শুনতে পাচ্ছিলাম মারের শব্দ। সাইয়িদ কুতুব চিৎকার করে বলছিলেন, ‘আমার সাথে যাইনাবের কোনো যোগাযোগ নেই। তার সাথে কথা বলার কোনো ইচ্ছা ছিল না।’ কিন্তু তারা থামেনি। মারতেই থাকল।”

সাইয়িদ কুতুবের ফুসফুসে সমস্যা ছিল। কারাগারের নির্যাতনে সেটা আরও বেড়ে যায়। এমনকি রক্তও বের হতো ফুসফুস থেকে। চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও কারারক্ষীরা সাইয়িদ কুতুবকে বেত্রাঘাত করে করে বলতো “দৌড় দাও, দৌড় দাও।” এই অবস্থা চলাকালে একদিন তিনি দৌড়াতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক করে ফেললেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় ষাট বছর। একজন বৃদ্ধকে এভাবে নির্যাতন করত তারা।

পরের বোঝা আপন কাঁধে

সাইয়িদ কুতুব শহীদ (রহিমাহুল্লাহ) জেলখানায় কখনো কোনো ইখওয়ান-কর্মীর দেখা পেলে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসতেন। তারা তখন চিৎকার করে অনুযোগ করতো, “আমাদেরকে এভাবে নির্যাতন করা হয়। ওভাবে বেত্রাঘাত করা হয়। সেভাবে পেটানো হয়।” কুতুব নিজেও যদিও এগুলো ভোগ করেছেন আরও বেশি,

তবু এসব শুনে কেঁদে দিতেন। দুআ করতেন তাদের জন্য।

কুতুব জানতেন, তারা যদি এই নির্যাতনের কথা কাউকে বলে, তবে আরও বেশি নির্যাতন করা হবে। তাই বিশ্ববাসীকে এই নির্যাতনের কথা জানানোর এই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন তিনি।

তাঁর কোর্ট ট্রায়ালে বিচারক হিসেবে ছিল মুহাম্মদ ফুয়াদ আদ দাজাউয়ী। লোকটা এতই ভীতু ছিল যে, ১৯৬৬ সালের আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে সে ইয়াহূদীদের ঘেরাওয়ে পড়ে ইয়াহূদীদের পক্ষে গিয়ে মুসলিমদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিল। তাই ইয়াহূদীরা তাকে ছেড়ে দেয়। সেই লোক কি না সাইয়িদ কুতুবের মতো এক ব্যক্তির বিচারক!

সে সাইয়িদ কুতুবের প্রতি খুবই অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছিল। কুতুবের বিচারিক নথিপত্রে আদ দাজউয়ীর অভদ্রতার ঘটনা অতি স্পষ্ট। সাইয়িদ কুতুবও এই গাদ্দারের দিকে অপমানকর ভঙ্গিতে তাকাতেন। এই চাহনি দেখে আরও ভয় পেয়ে গেছিল ভীতু লোকটা।

জিজ্ঞাসাবাদে যেমন সাইয়িদ কুতুব সব স্বীকার করে নিয়েছিলেন, আদালতেও তা-ই করেন। স্পষ্ট ভাষায় বললেন, "হ্যাঁ, এটা আমি করেছি। এজন্যই করেছি। তোমরা সবাই দুর্নীতিবাজ। জামাল আবদেন নাসেরকে হত্যা করা আমাদেরই পরিকল্পনা ছিল। তোমাদের শাসন আমি মানি না।" মোটকথা, তিনি সবকিছুর দায় একবাক্যে নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব তুলে নেন। তিনি জানতেন যে, শীঘ্রই তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হবে। কারাগার থেকে একটি চিঠি লিখেন তিনি। কারাগারে থাকা অবস্থাতেও তাঁর বলিষ্ঠ ঈমানের তাকৎ ফুটে ওঠেছে এ চিঠিতে।

অনেকগুলো মানবাধিকার সংগঠন থেকে শুরু করে বহু রাজনৈতিক নেতা সাইয়িদ কুতুবকে মুক্তি দিতে সুপারিশ করেন। কারণ, এই ব্যক্তির মেধা ও প্রতিভা সম্পর্কে জানতেন তারা। এমনকি সৌদি বাদশাহ ফয়সাল পর্যন্ত মিশর সরকারকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ মওকুফ করতে বলেন। কিন্তু জামাল উলটো বলে, "আমরা আগামীকাল ফজরের পরপরই সাইয়িদ কুতুবের ফাঁসি কার্যকর করব।"

ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান

সে রাতে সাইয়িদ কুতুব শহীদের (রহিমাহুল্লাহ) কাছে তাঁর বোন হামিদাকে পাঠানো হয় এই বার্তা দিয়ে যে, তিনি যেন কুতুবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নাসেরের কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি করান। একবার শুধু নিজেকে এসব পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কহীন বলতে হবে, ব্যস। দোষ চাপাতে হবে ইখওয়ানীদের ওপর। আর কিচ্ছু লাগবে না। এই প্রস্তাব শুনে সাইয়িদ কুতুব বললেন,

والله لو كان هذا الكلام صحيحًا لقلته، ولما استطاعت قوةٌ على وجه الأرض أن تمنعني من قوله. ولكنه لم يحدث وأنا لا أقول كذبًا أبدًا

"মহান আল্লাহর কসম! এই কথা যদি সঠিক হতো তবে আমি তা-ই বলতাম। পৃথিবীর বুকে এমন কোনো শক্তি নেই, যা আমাকে ঐ কথা বলা থেকে বিরত রাখতে পারে। কিন্তু সেটা তো সঠিক কথা নয়। আমি মিথ্যা বলতে পারব না।"

তারা অনেকে মিলে বহু চেষ্টা করল নাসেরের কাছে কুতুবকে ক্ষমা প্রার্থনা করাতে। কিন্তু সাইয়িদ কুতুব তাঁর দাবীতে অনড়।

হামিদাকে বললেন যে, তিনিই গোপনভাবে পরিচালিত ইখওয়ানী মিশনের মূল ব্যক্তি। তখন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রধান ছিলেন হাসান হুদাইবি। কিন্তু সাইয়িদ কুতুব, হাসান হুদাইবিকে কোনো বিপদে ফেলতে চাচ্ছিলেন না। এও চাচ্ছিলেন না যে, তাঁর সংগঠন ইখওয়ান কোনো বিপদের মুখে পড়ুক। তাই তিনি সকল দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সাজা ভোগ করেন। বোনকে বলেন,

إن رأيت الوالد المرشد حسن الحديبي فبلغيه عني السلام، وقولي له لقد تحمل السيد أقصي ما يتحمل البشر حتي لا تمس بأدني سوء،

"হাসান হুদাইবির দেখা পেলে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দিয়ো। বোলো যে, একটা মানুষ যতটা সহ্য করতে পারে, সাইয়িদ কুতুব তার চেয়েও বেশি সহ্য করেছে যেন আপনাকে এতটুকু অমঙ্গলও স্পর্শ না করে।"

সাইয়িদ কুতুব শহীদ ইখওয়ানুল মুসলিমীনের জন্য যে নির্যাতন ভোগ করেছিলেন,

তা পুরো সংগঠন মিলেও ভোগ করেনি।

সাইয়িদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহকে ফাঁসির কাষ্ঠে ওঠানোর আগে ওখানে ফুয়াদ আল্লাম নামে এক অফিসার ছিলেন। তিনিও একই প্রস্তাব রেখেছিলেন সাইয়িদ কুতুবের কাছে। বলেছিলেন, "আসলেই আপনাকে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। আপনি মুখে একটু ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন মাত্র। একবার ক্ষমা চাইলেই হবে। আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।" তখনও কুতুবের প্রত্যাখানমূলক সুদৃঢ় জবাব ছিল,

لن أعتذر عن العمل مع الله،

"আল্লাহর জন্য যে কাজ করেছি, তাতে কোনো অজুহাত দেখাব না।"

অফিসার আবার বলেন, "জনাব, শুধু মিনতি করবেন একটু। আমি এখনই সরকারকে জানিয়ে দেবো।" সাইয়িদ কুতুব উত্তরে বলেন, "কেন মিনতি করব? যদি আমি সংভাবে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকি, তাহলে আমি এই সিদ্ধান্তেই সন্তুষ্ট। আর যদি অন্যায়ভাবে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে থাকি, তাহলে বাতিলের কাছে মিনতি করার নীচুতা থেকে আমি অনেক উর্ধ্বে!"

এরপর বলা হলো, তাহলে যেন নাসেরের উদ্দেশ্যে কয়েকটা শব্দ লিখে স্রেফ ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। তিনি বললেন,

إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن يكتب حرفا واحدا يقر به حكم طاغية

"যে আঙুল সালাতের তাশাহহুদে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের সাক্ষ্য দিতে উত্তোলিত হয়েছে, তা কখনোই বাতিল প্রশাসনের স্বীকৃতিতে একটা বর্ণ লিখতেও অবনত হতে পারে না।"

পরদিন ফাঁসির কাষ্ঠে নিয়ে যাওয়ার সময় হাসছিলেন সাইয়িদ কুতুব। সবাই দেখল তিনি যেন বেশ উৎফুল্ল। তাঁর লেখা শেষ চিঠিতে লিখেছিলেন,

"আমি তো এই মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলাম। আমার জীবনের স্মরণীয়তম মুহূর্ত তো এটিই। আমি আকীদাহ পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি। ধর্মকে পুরোপুরি অনুধাবন করেছি, যা আগে কখনোই পুরোপুরি বুঝতে পারিনি। এখন আছি

শাহাদাতের অপেক্ষায়। এই জীবনের চেয়ে সুখকর জীবন আমি কখনো কাটাইনি।”

ফাঁসির পূর্বে তাঁর সহাস্যমুখ টিভি ও ক্যামেরায় ধারণ করা হয়। তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পুরোপুরি প্রস্তুত এবং অপেক্ষারত। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কেউ যদি আল্লাহর জন্য কিছু করে, তবে তার শেষ পরিণতি হয় শাহাদাত।

২৯শে আগস্ট, ১৯৬৬ সাল। সাইয়িদ কুতুবকে অপর দুই সঙ্গীসহ ফাঁসিতে ঝোলানো হলো। অপর দুইজন ছিলেন, আবদেল ফাত্তাহ ইসমাঈল ও মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ হাওয়াশ। তাঁরাও ইখওয়ানের সদস্য। রহিমাহুমুল্লাহ। তাঁরা আল্লাহর কাছে হাসিমুখে চলে গেলেন।

সে রাতটি ছিল জুমুআর রাত। সে রাতে কারাগারে ইখওয়ানের অন্যান্য সদস্যরা তিলাওয়াত করলেন,,

وَاتلُ عَلَيہِم نَبَاَ ابنَى اٰدَمَ بِالحَقِّ اِذ قَرَّبَا قُربَانًا فَتُقُبِّلَ مِن اَحَدِہِمَا وَ لَم يُتَقَبَّل مِنَ الاٰخَرِ قَالَ لَاَقتُلَنَّک قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ المُتَّقِين

“আর আদমের দু ছেলের কাহিনী আপনি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনান। যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল অতঃপর একজন থেকে কবুল করা হলো এবং অন্যজনের কবুল করা হলো না। সে বলল, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। অন্যজন বলল, আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকীদের পক্ষ হতে কবুল করেন।”[৭৪]

জুমুআর সালাতেও এই আয়াতের তিলাওয়াত করা হলো। কান্নায় ভেঙে পড়ল সবাই। যারা আল্লাহর জন্য শহীদ হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা তাঁদের সমগ্র জীবনটাই উম্মাহর জন্য অনুকরণীয় করে দেন। সাইয়িদ কুতুবের শাহাদাতের পর নিষিদ্ধ করা হয় তাঁর লিখিত বই ‘মাআলিম ফিত তরিক’ ও ‘তাফসীর ফি যিলালিল কুরআনিল কারীম’ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এই বই দুটি গোটা বিশ্বে সাড়া ফেলে দেয়। বই দুটি নিষিদ্ধ হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজেরাই লিখে লিখে অনুলিপি করে রেখেছিল, যেন তাদের সংগ্রহ থেকে হারিয়ে না যায়।

---

[৭৪] সূরা মাইদা, ৫:২৭।

ইসলাম সম্পর্কে জানে, আকীদাহ বুঝে, হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে, এরকম কোনো মুসলিম দেখলেই বুঝবেন যে, তারা এই বই দুটি পড়েছে। মুসলিমিনের নেতারাও এত কষ্ট সহ্য করছেন এসব বইয়ে বর্ণিত চিন্তাধারার প্রভাবেই। ব্যক্তি সাইয়িদ কুতুব শহীদ হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর মতাদর্শ ও চিন্তাধারা বেঁচে আছে। চিরকাল বেঁচে থাকবে এবং উম্মাহর মাঝে জাগিয়ে তুলবে সঞ্জীবনী শক্তি।

বিশ্বজিহাদের পথিকৃৎ

শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম ﵀

প্রতিটি আরব মুজাহিদের হৃদয়ে যিনি শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন, আরব সহ সমগ্র বিশ্বের সকল মুজাহিদের কাছে যিনি অনুসরণীয়, তাঁর নাম শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ)। বিগত দশ-বিশ বছরে যুদ্ধরত ছিল বা এখনও আছে, এরকম যেকোনো মুসলিম ভূখণ্ডের মুজাহিদগণ আব্দুল্লাহকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে।

একাই এক জাতি

শাইখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

> **"শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম একক কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন পুরো একটি জাতি।"**

একটি সামরিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শাইখ আযযাম, যেখানে মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বলতো,

إنا نشوم منك يا شيخ رائحة السلف

"হে মুজাহিদদের শাইখ! আমরা আপনার মাঝে সালাফদের সুঘ্রাণ পাই।"

শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযামের মাঝে হাসান বাসরির যুহদ তথা দুনিয়াবিমুখতা, ইমাম আবূ হানিফা ও সুফিয়ান সাওরির মতো ফিক্বহের পাণ্ডিত্য, মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের মতো জিহাদী চেতনা, এবং ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার মতো সাহসিকতা দেখা যেত। রহিমাহুমুল্লাহ। এছাড়াও ইমাম হাসান আল বান্না, সাইয়িদ কুতব শহীদ ও

শহীদ আবুল আ'লা মাওদুদী সহ সকলের চিন্তাচেতনা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ইসলামী জাগরণের মনোভাব যেন একাই শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযামের মাঝে একীভূত ছিল। তিনি ছিলেন তাদের সকলের চিন্তার সমন্বিত ব্যক্তিত্ব।

এমনকি কাফিররাও তাঁকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে। কারণ তিনি তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শত্রুদের একজন। একবিংশ শতকের জিহাদী চেতনার উত্থানে সবচেয়ে বেশি দায়ী করা হয় তাঁকে। এমনকি বলা হয়, উসামা বিন লাদেনের তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ)।

সীমান্তের কাঁটাতার মাড়িয়ে, জাতীয়তাবোধের বন্ধন ছিঁড়ে, সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের কাছে ইসলামী জাগরণের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনেও সবচেয়ে বেশি অবদান শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযামের চিন্তাচেতনার।

আরো একজন কাফির বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষক তাঁকে আখ্যায়িত করেছে আফগান জিহাদের তাত্ত্বিক গুরু এবং গ্লোবাল জিহাদের গডফাদার হিসেবে।

তারুণ্যের দিনগুলো

শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) ১৯৪১ সালে ফিলিস্তিনের জেনিন প্রদেশে একটি ইসলামী ভাবাপন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সে সময়ের ফিলিস্তিন সংগ্রামের একজন প্রসিদ্ধ মুজাহিদ। তাই শৈশব থেকেই মনেপ্রাণে ইসলামী জাগরণের অনুভূতি নিয়ে বেড়ে ওঠেন আবদুল্লাহ আযযাম। অল্পবয়সে যোগদান করেন 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' তথা মুসলিম ব্রাদারহুডে।

নিজ এলাকায় পড়াশোনা সম্পন্ন করার পর তিনি জর্ডানের একটি গ্রামে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে ভর্তি হন দামেশকের শরীয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীয়াহ বিভাগে।

১৯৬৭ সালে যখন ইয়াহূদীরা ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর দখল করে, তখন পশ্চিম তীরস্থ ফিলিস্তিনীদের প্রতিরোধ করার কিছুই ছিল না। একপ্রকার বিনা বাধায় পশ্চিম তীর দখল করে নেয় ইয়াহূদীরা। তখন শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম রহিমাহুল্লাহ একাই প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সেটাই ছিল তাঁর প্রথম জিহাদ। অংশগ্রহণ করেন সেখানে জিহাদরত ইখওয়ানুল মুসলিমীনের মুজাহিদদের সাথে। এ ছাড়াও বেশকিছু

যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি। তার অংশগ্রহণ করা এক প্রসিদ্ধ যুদ্ধে নিহত হয় ৬১ জন ইয়াহূদী সৈন্য। ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ এ ঘটিত কিছু যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করে প্রশংসিত হয়েছিলেন।

১৯৭১ সালে আবদুল্লাহ আযযাম আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে মিশর যা। সেখান থেকে পি.এইচ.ডি সম্পন্ন করেন 'উসূলুল ফিকহ' (ইসলামী আইনশাস্ত্রের মূলনীতি) বিষয়ে। এর আগে ১৯৭০ সালে ২৯ বছর বয়সে জর্ডানের আম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন তিনি। সেসময়ে মুসলিম বিশ্বে মাত্রই জিহাদের সূচনা হচ্ছিল।

১৯৭৩ সালে মিশরে অবস্থানকালে তিনি শহীদ সাইয়িদ কুতুবের রহ. পরিবারের খোঁজখবর নিতেন। সাইয়িদ কুতবের বেশ ভালোরকম প্রভাব ছিল তাঁর ওপর।

ফিলিস্তিনে আশাভঙ্গ

দখলদার ইয়াহূদীদের আগ্রাসন শুরু হলে ফিলিস্তিনী লোকজন প্রতিরোধ শুরু করে। এর মধ্যে পিএলও (ফাতাহ) সমর্থক ও কর্মীরাই ছিল বেশি। তখনও হামাস প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) তাদের সাথে ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগ দেন।

কিন্তু প্রতিরোধ আন্দোলনের লোকগুলো নৈতিকভাবে শক্তিশালী ছিল না। তারা দিনের বেলা যুদ্ধ করত ঠিকই। কিন্তু সারারাত মুভি দেখত, গান শুনত, আর কার্ড খেলত। হাজারও মানুষকে সালাতের জন্য আহ্বান করা হলে উপস্থিত হতো একেবারেই হাতেগোনা ক'জন লোক। আবদুল্লাহ আযযাম তাদের সংশোধনের অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। উলটো বিরুদ্ধাচরণ করে তারা। ইসলামের যে জিহাদের রূপরেখা তিনি জেনেছেন, তার সাথে এর কোনো মিলই নেই। এ অবস্থা দেখে তিনি বিফল মনোরথে ফিলিস্তিনের রণাঙ্গন ত্যাগ করে সৌদি আরব চলে আসেন।

৮০'র দশকে সৌদি আরবের জিদ্দায় কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার প্রস্তাব পেলে তা গ্রহণ করেন তিনি। কিন্তু শুধু শিক্ষক বা আলিম হলেই যে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, এই বোধ চিরকাল তাঁর অন্তরে ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন,

"জিহাদ এবং রাইফেল ছাড়া কোনো সমাধান নেই। আলোচনা, সম্মেলন, বা

সংলাপে কিছুই হবে না।"'[৭৫]

১৯৮০ এর দশকে ইসলামী ভূমিতে যে সকল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দখলদার ছিল, তাদের উদ্দেশ্যে এটা শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের আপোষহীন জবাব।

আফগানে নতুন আশা

১৯৮০ সালে এক আফগান প্রতিনিধি সৌদিতে আসেন। শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযামের (রহিমাহুল্লাহ) দেখা হয় তার সাথে। তার মুখে শুনতে পান আফগানদের বীরত্বের কথা। তাদের আন্দোলন, জিহাদ, ত্যাগ ও নিষ্ঠার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান তিনি। তাঁর অভিভূত ভাব দেখে উক্ত মুজাহিদ শাইখ আবদুল্লাহ আযযামকে তাদের সাথে যোগ দিতে বলেন। তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়ে শিক্ষকতার পেশা ত্যাগ করে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে চলে আসেন আবদুল্লাহ আযযাম। এ সিদ্ধান্ত মোটেই সহজ ছিল না। একটি দেশের সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে আসতে প্রচণ্ড মানসিক শক্তিশালী দরকার। কিন্তু আফগান মুজাহিদগণকে কাছ থেকে দেখতে আবদুল্লাহ আযযাম এ কাজটিই করেন। যেন তিনি যাচাই করতে পারেন, তারাও কি পিএলও এর যোদ্ধাদের মতো খামখেয়ালি ও বেআমলি নাকি সত্যিকার মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ। তিনি তাদের মাঝে সত্যিকার অর্থেই দেখতে পান জিহাদী চেতনা। তাই প্রথমে ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় যোগ দিলেও পরবর্তীতে তা বাদ দিয়ে পুরোদমে জিহাদের জন্য কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি প্রায়ই আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি বলে মুজাহিদদের উদ্দীপ্ত করতেন,

" مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة ستين سنة "

"আল্লাহর পথে জিহাদের ময়দানে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা ষাট বছর ইবাদাতে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়েও শ্রেষ্ঠ।"[৭৬]

পরে তিনি নিজের পরিবারকে নিয়ে আসেন পেশওয়ারে। ধীরে ধীরে জিহাদী কাজের

[৭৫] Join the caravan-ইলহাক বিল কাফিলাহ
[৭৬] সহিহ আল জামি

ধারায় আরও জড়িয়ে পড়েন। মুজাহিদদের কাজের সাথে তিনি পরিচিত হতে থাকেন আরও ভালোভাবে।

জিহাদের আরও গভীরে

শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) পেশোয়ারে অবস্থানকালে তাঁর প্রিয়বন্ধু উসামা বিন লাদেনকে সাথে নিয়ে বায়তুল আনসারে যোগ দেন। এটি ছিল মুজাহিদদের সেবামূলক একটি সংস্থা। সংস্থাটি আফগান মুজাহিদদের সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করত। বাহির থেকে আসা নতুন মুজাহিদদের প্রয়োজন হতো তারবিয়াহ, প্রশিক্ষণ ও পরিচিতি। তাই এসব মুজাহিদদের আফগানিস্তানের ফ্রন্টে পাঠানোর আগে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ দিত বাইতুল আনসার। শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম ছিলেন সংস্থাটির একজন শিক্ষক।

পরবর্তীতে জিহাদের প্রথম কাতারে গিয়ে শামিল হন আবদুল্লাহ আযযাম। হাতে তুলে নেন অস্ত্র। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন সম্মুখ লড়াইয়ে। অসম সাহসিকতায় ছুটে চলেন এক ফ্রন্ট থেকে আরেক ফ্রন্টে। এক রণক্ষেত্র থেকে আরেক রণক্ষেত্রে। এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে। লোগার, কান্দাহার, হিন্দুকুশ পর্বতমালা, পাঞ্জশির উপত্যকা, কাবুল আর জালালাবাদে।

এসব যুদ্ধে তিনি আফগান মুজাহিদিনের সাথে ঘটা অলৌকিক সব কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। সালাফদের জীবনে যা কিছু ঘটেছে, সেসবের প্রতিচ্ছবিই যেন আফগান রণাঙ্গন।

বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ

আফগান-রাশান যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করায় রণাঙ্গনের সাধারণ যোদ্ধাদের সাথে পরিচয় হয় আবদুল্লাহ আযযামের (রহিমাহুল্লাহ)। হয় সখ্যতা ও বন্ধুত্ব। তাদের মধ্যকার সমস্যাগুলো বুঝতে পারেন তিনি। সেসবের উপযুক্ত সমাধান দেন। যেমন, আফগান যুদ্ধের মুজাহিদগণ বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের হওয়ায় তাদের মাঝে নানান বিষয়ে মতানৈক্য হতো। সেসব সমস্যা মিটিয়ে দিতেন তিনি। তাদেরকে বলতেন,

"আমরা মুসলিমরা কখনো শত্রুদের হাতে পরাজিত হই না। শত্রু আমাদেরকে পরাজিত করতে পারে না, যদি না আমরা নিজেরাই নিজেদের কাছে পরাজিত হই। ইতিহাস আমাদেরকে তাই-ই দেখিয়েছে। যুগে যুগে আমাদের পরাজয়ের কারণ অন্তঃকলহ।"

আব্দুল্লাহ আযযাম অন্যান্য ইসলামী দলের নেতাদের সাথেও দেখা করেন। যেমন- ইখওয়ানুল মুসলিমীন, জামাআতে ইসলামী। তাদেরকে আফগান জিহাদের গুরুত্ব বুঝিয়ে সমর্থন আদায় করেন যতদূর সম্ভব।

আমেরিকা, মালয়েশিয়া, জার্মানি সহ অনেক দেশ সফর করেছেন তিনি। নিরসন করেছেন আফগান জিহাদ নিয়ে সকল সন্দেহের। যুদ্ধে সাফল্যের জন্য এই বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থন আদায়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযামের চেতনা, কঠোর পরিশ্রম অবশেষে সফলতার মুখ দেখতে পায়। ফলে আফগান জিহাদ শুধু আফগান জনতার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাপক গুরুত্ব লাভ করে তা। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলিমরা আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ছুটে আসতে থাকে।

তিনি একটা কথা প্রায়ই বলতেন, "ইসলামের ইতিহাস শহীদদের রক্তে রচিত হয়েছে।"

তাঁর এ কথা সত্য। ইসলামের প্রথম যুগের সোনার মানুষ সাহাবিদের জীবনী পর্যালোচনা করলেও এ বাস্তবতাই প্রতিভাত হয়।

শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) যে কোনো জটিল বিষয় সহজ করে বোঝাতে পারতেন। এটা তাঁর রচিত যতগুলো গ্রন্থ আছে, সবগুলোর বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হলো,

১. ইলহাক বিল ক্বাফিলাহ (এসো কাফিলাবদ্ধ হই)
২. আদ দ্বিফাউ আন আরাদ্বিল মুসলিমীন আওয়ালু ফারিদ্বাতিন বা'দাল ঈমান (মুসলিম ভূমিসমূহের প্রতিরক্ষা: ঈমানের পর প্রথম ফরয)
৩. তারবিয়্যাহ জিহাদিয়্যা
৪. তাফসীরে সূরা তাওবা

৫. আয়াতুর রাহমান ফি জিহাদিল আগফানিস্তান (আফগানিস্তানে আমার দেখা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ)

৬. Lovers of the maidens of the paradise-কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে

৭. হুকমুল আ'মাল ফিল জামাআহ (Ruling of working in islamic groups)

পাশাপাশি তিনি দুটি ম্যাগাজিন বের করতেন। একটি মাসিক অপরটি সাপ্তাহিক। এই ম্যাগাজিনগুলোতে কাফিরদের নানান প্রোপাগান্ডা ও অসত্য তথ্যের জওয়াব দিতেন তিনি। বানচাল করে দিতেন তাদের মিথ্যাচার।

'ইলহাক্ব বিল ক্বাফিলাহ' (এসো কাফিলাবদ্ধ হই) বইটি খুবই ছোট। অথচ এটি পুরো বিপ্লবের রূপরেখা। এই বইয়ে তিনি জিহাদ সম্পর্কিত সকল সন্দেহ নিরসন করেন। উসুলে ফিক্বহের আলিম হিসেবে এ ব্যাপারে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন তিনি। 'বর্তমানে খলীফা নেই, তাই জিহাদ ফরয নয়' এরকম যত ভুল ধারণা আছে, সেগুলো খণ্ডন করে দেন। প্রমাণ করেন এসবের অন্তঃসারশূন্যতা।

তাঁর অন্য একটি বই 'Defence of the Muslim land: The first obligation After Iman'[৭৭] এ তিনি মুসলিম ভূখণ্ড রক্ষার আবশ্যকীয়তা তুলে ধরেছেন। বক্তব্যের অকাট্যতা প্রমাণের জন্য তিনি পৃথিবীর বহু আলিমের কাছে গিয়েছেন আলাদা আলাদাভাবে। তাদের মতামত একত্র করেছেন। নিয়েছেন সকলের স্বাক্ষর। এটা খুবই কষ্টকর কাজ ছিল। কিন্তু তিনি উম্মাহর প্রয়োজনে এই কাজটি করেছেন। যেন পরবর্তীতে জিহাদের বিরুদ্ধে কোনোরকম আপত্তি তুলতে না পারে কেউ। তিনি প্রায়ই বলতেন,

> **"জিহাদ ততদিন চলবে, যতদিন পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে এক আল্লাহর ইবাদাত না করা হবে। জিহাদ চলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সব নির্যাতিত মানুষকে মুক্ত করা হবে। জিহাদ চলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের সম্মান ও লুণ্ঠিত ভূমিগুলো ফিরিয়ে আনা হবে। জিহাদ চলতে থাকবে, যতক্ষণ খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হবে। জিহাদ হলো চিরস্থায়ী মর্যাদার পথ।"**

[৭৭] বইটি বাংলায় 'মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা' নামে অনূদিত হয়েছে।

নয় বছরের প্রৌঢ়

শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) বলতেন,

"আমি মনে করি, আমার প্রকৃত বয়স হচ্ছে নয় বছর। সাড়ে সাত বছর কেটেছে আফগান জিহাদে আর দেড় বছর ফিলিস্তিন জিহাদে। এছাড়া জীবনের বাকী সময়গুলোর কোনো মূল্য আমার কাছে নেই।"

উসুলুল ফিকহে পিএইচডি, দাওয়াহ, ও শিক্ষকতার চেয়েও তিনি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান জ্ঞান লাভ করেছেন জিহাদের ভূমিতে কাটানো সময়টুকুকে। তিনি আরও বলেন,

لن أترك الجهاد إلا بإحدي الثلاث،إما أن أقتل في أفغانستان وإما أن أقتل في بشاور وإما أن أخرج مكبلا من باكستان

"শুধু তিনটি অবস্থায় আমি জিহাদের ভূমি ত্যাগ করতে পারি। হয় আফগানিস্তানে নিহত হব, নতুবা পেশোয়ারে নিহত হব, নতুবা হাত বাঁধা অবস্থায় আমাকে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করা হবে।"

তাঁর শাহাদাতের পর পরিবারের লোকেরাও বলেছেন যে, তিনি পরিবারে বেশি সময় দিতেন না। ফজরের সময় ঘর থেকে বের হতেন, ফিরতেন মধ্যরাতে। মাঝখানের সময়টুকু জিহাদের জন্য ব্যয় করতেন। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হওয়ায় পত্রিকা, ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হতে থাকতো তাঁর চলাফেরা ও কর্মকাণ্ড।

শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম ছিলেন আঞ্চলিকতাপ্রীতি ও জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে। মানুষ তাঁকে বলতো, "আপনি ফিলিস্তিনের ময়দান ছেড়ে আফগানিস্তান এসেছেন কেন?"

তিনি বলতেন,

"ওয়াল্লাহি! আল্লাহর জন্যই ফিলিস্তিন ছেড়েছি। আফগান আমার কাছে জন্মভূমির চেয়ে কম প্রিয় নয়। ফিলিস্তিনের খলীল এলাকা আমাকে যতটা

টানে, ঠিক ততটাই টানে কাবুল আর পেশোয়ার। আল্লাহ এবং আল্লাহর আদেশ জিহাদের উদ্দেশ্যে আমি ফিলিস্তিনের ভূমি ত্যাগ করে আফগান এসেছি। ফিলিস্তিন আমাদের অন্তরে, আমাদের মুখে। তবুও ফিলিস্তিন ত্যাগ করে কিছু করতে এসেছি। ফিলিস্তিনকে মুসলিমরা কখনো ভুলবে না।”

ব্যক্তিজীবনে ধার্মিকতা

শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের মাঝে যে অধঃপতন দেখে এসেছেন, তাঁর নিজের জীবন ছিল সেগুলোর বিরুদ্ধে জলজ্যান্ত আদর্শ। তিনি কখনও কারও সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করতেন না। যেখানেই যেতেন, সেখানেই পেতেন সকলের শ্রদ্ধা। নিয়মিত নফল সিয়াম পালন করতেন। বিশেষ করে নবি দাউদের (আলাইহিস সালাম) সুন্নাহ অনুযায়ী একদিন পরপর। এভাবে সারা বছর। এছাড়া সোমবার ও বৃহস্পতিবারে নিজে তো সিয়াম পালন করতেনই, অন্যদেরও উৎসাহিত করতেন।

আরও একটি জিনিস তিনি বেশি করতেন। তা হলো, আযকার। নিজেও যিকর আযকারে মশগুল থাকতেন, মানুষকেও বলতেন যিকরের ফজিলতের কথা। হাঁটতে চলতে বা জগিং করার সময় প্রতি কদমে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করতে বলতেন। কারণ, সুবহানাল্লাহ বলার বদৌলতে জান্নাতে একটি গাছ তৈরি হওয়ার কথা হাদীসে আছে।

শাইখ আযযামকে যারা অপছন্দ করত, তারাও তাঁকে পছন্দ করতে শুরু করে একসময়। একবার এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটল। পেশোয়ারে কিছু উগ্র স্বভাবের লোক ঘোষণা দিল, শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম কাফির হয়ে গেছেন। কারণ তিনি মুসলিমদের সম্পদ তাদের কাছ থেকে নিয়ে অপচয় করেন। শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ এ সংবাদ শুনে বিস্মিত হলেন না, ক্ষিপ্তও না। উলটো কিছু উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে দিলেন তাদের জন্য। এরপরও কটু কথা অপবাদ ছড়ানো অব্যাহত রাখল কিছু লোক। পরে একসময় তাদের ভুল ভাঙে। তখন তারা বলতে লাগল,

> “আল্লাহর কসম, আমরা কখনোই শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের মতো মানুষ দেখিনি। তিনি আমাদের নিয়মিত অর্থ ও উপহার সামগ্রী দিয়ে যেতেন। অথচ

আমরা তার বিরুদ্ধে কটুবাক্য বলতাম।”

তিনি তাদের আচরণকে ব্যক্তিগতভাবে নেননি। তিনি কাজের লোক ছিলেন, তাই কাজ করে গেছেন। কানেই তোলেননি কারও কথা।

তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি দুনিয়াকে ভালোবাসেননি। জীবনে চলার পথে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া আর কিছুর মালিক হননি। অথচ তিনি চাইলে পারতেন পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত থাকতে। তার যুহদ ছিল হাসান বাসরির (রহিমাহুল্লাহ) মতোই।

তিনি গীবত খুবই অপছন্দ করতেন। গীবত মুসলিমদের মধ্যকার বন্ধনকে ধ্বংস করে দেয়। কেউ তাঁর কাছে অন্য কারও দোষত্রুটি বলতে আসলেই তিনি শুনতে প্রত্যাখ্যান করতেন সেসব।

শিশুদের অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতার প্রতি তিনি দিতেন বিশেষ গুরুত্ব। বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন কাজের জন্য পুরস্কৃত করতেন। যেমন, বাচ্চাদের বলতেন, “যে আগামী একঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকবে, তাকে আমি ১০০ রুপি দেবো।” অথবা, “যে এক পৃষ্ঠা কুরআন মুখস্থ করে আমাকে শুনাতে পারবে, তাকে আমি ৫০ রুপি দেবো।”

আবার কখনো কখনো তাদেরকে জান্নাতি বৃক্ষের কথা শুনিয়ে ‘সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম’ এই যিকরটি করাতেন।

জীবন-সায়াহ্নে

শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযামের (রহিমাহুল্লাহ) শত্রু শুধু রাশিয়ানরাই ছিল না। তারা তো আফগান ভূমিতে পরাজিত হয়ে চলেই গেছে। কিন্তু ঘরে বাহিরে আরও বহু শত্রু ছিল তাঁর। আফগানে, পেশাওয়ারে, কাবুলে। তাঁকে হত্যা করতে তারা ছিল সদা তৎপর।

পেশোয়ারে তিনি এক মাসজিদে নিয়মিত জুমুআর সালাত পড়াতেন। সালাতের আগে দিতেন অগ্নিঝরা বক্তৃতা। বহু মানুষ তাঁর বক্তৃতা শুনতে ছুটে আসতো দূর দূরান্ত থেকে।

১৯৮৯ সালের ঘটনা। শত্রুরা মিম্বারের নিচে একটি প্রচন্ড শক্তিশালী টিএনটি

বিস্ফোরক রেখে দেয়। এটা এতই ভয়াবহ ছিল যে তা বিস্ফোরিত হলে পুরো মাসজিদটি ধ্বসে পড়ত। মাসজিদের হয়তো কেউই বাঁচতো না। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা ছিল ভিন্ন। তাই তা বিস্ফোরিত হয়নি!

তিনি তাঁর জীবনের শেষ বক্তব্যটি দিয়েছিলেন লাহোরে। সেই বক্তব্যে তিনি হামদ ও দরূদ পাঠ করে এই আয়াতটি পড়েন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٩٣﴾

"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়, তবে তারা যা করে আল্লাহ তো তার ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা।"[৭৮]

তাঁর শেষ বক্তব্যের সারমর্ম ছিল, মুসলিমদেরকে আগে পরিপূর্ণ দ্বীন মান্য করতে হবে। এরই অংশ নিজেদের ভূমির প্রতিরক্ষা। তবেই পৃথিবীকে টেক্কা দিতে পারবে তারা। অন্যথায় নয়। ইসলামী ভূমি প্রতিষ্ঠা করতে হলে সে পদ্ধতিতেই করতে হবে, যেভাবে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনাকে ইসলামী ভূখণ্ডে পরিণত করেছিলেন।

এরপর শাইখ বলেন, গত তিন শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর পতনের মূল কারণ হলো, তারা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে।

এরপর শাইখ বলেন, পশ্চিমারা দাবি করে রাশিয়াকে তারা তাড়িয়েছে। যুদ্ধে পরাজিত করেছে। এটা ভুল। পশ্চিমারা করেনি। বরং আমরাই করেছি তাদেরকে পরাজিত। জয়ের ব্যাপারে ভুল ধারণা রাখা যাবে না।

তিনি তার সেই বক্তব্যে পশ্চিমা মিডিয়ার তিনটি প্রোপাগান্ডা তুলে ধরেন।

১. প্রথমত, পশ্চিমা মিডিয়া আফগান জিহাদকে বৈশ্বিক জিহাদ হিসেবে দেখায় না। তারা এটিকে একটি আঞ্চলিক লড়াই হিসেবে দেখাতে চায়।

২. দ্বিতীয়ত, তারা এই জিহাদকে জিহাদ হিসেবেই মানতে রাজি নয়। তারা আফগান জিহাদকে একটি আন্তঃদেশীয় লড়াই হিসেবে উপস্থাপন করে।

৩. তৃতীয়ত, তারা মানুষের মাঝে জিহাদ সম্পর্কে ভুল বার্তা দিয়ে মানুষকে জিহাদের পথ থেকে সরিয়ে রাখতে চায়। আফগান জিহাদে যোগদানের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করতে চায়।

এরপর শাইখ বলেন,

"আমরা মুসলিমরা আর কী চাই? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অসংখ্য নিয়ামাত দিয়েছেন। আফগানে আমাদের নিজস্ব ভূমি দান করেছেন। আমাদেরকে মুসলিম আমীর দান করেছেন। আমাদেরকে অস্ত্র দিয়েছেন। সবকিছুই আমাদের আছে। মুসলিমরা আর কখন ঘুরে দাঁড়াবে? এটাই তো সুযোগ। আসল সময় তো এটাই।"

শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম এই বক্তৃতায় আরও বললেন,

"জিহাদ ছাড়া ইসলামী ভুমি তৈরির ভিন্ন কোনো উপায় নেই। বহু বছর ধরেই মুসলিম নেতা, আলিমগণ বহু চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু সফল হননি। একমাত্র আফগান ফ্রন্টে যা অর্জিত হয়েছে, তা অন্য কোনোভাবে অর্জন হয়নি।"

এরপর তিনি এই বক্তব্যে মুজাহিদগণের সাফল্য ও ত্যাগগুলো তুলে ধরেন।

তিনি প্রায়ই বলতেন,

"মানুষেরই প্রয়োজন জিহাদের। জিহাদের মানুষ প্রয়োজন নেই।"

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ, ইলেকট্রিশিয়ান, সার্জন সহ সকলকেই জিহাদের ময়দানে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করেন তিনি। তার এই বক্তব্য তিনি শহীদ হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগের।

শাহাদাত

এরপর এলো তাঁর শাহাদাতের মুহূর্ত। ১৯৮৯ সালের ২৪শে নভেম্বর। শুক্রবার।

শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) জুমুআর জন্য প্রস্তুত হলেন। পরিধান করলেন নতুন কাপড়। সালাতুত দুহা আদায় করে বের হলেন গাড়ি নিয়ে। যে পথ দিয়ে জুমুআর সালাত আদায় করতে যেতেন, সে পথে শত্রুরা তিনটি ২০ কিলোগ্রামের বোমা পুঁতে রেখেছিল। রাস্তাটির নাম 'জামুদ'। খুবই সরু রাস্তা। একটির বেশি গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে না। দুপুর ১২.৩০ মিনিটে শাইখের গাড়িটি ঠিক বোমা যেখানে পুঁতে রাখা হয়েছিল সেখানে এসে থামল। সে গাড়িতে ছিলেন শাইখ ও তাঁর দুই ছেলে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ। তাঁর আরেক পুত্র তামীম আদনানী পেছনে পেছনে আসছিল আরেকটি গাড়িতে করে।

শাইখ গাড়ি থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলেন। আর তখনই বিকট শব্দ করে বিস্ফোরিত হয় শত্রুদের পুঁতে রাখা বোমা। বিস্ফোরণের ভয়াবহ আওয়াজে কেঁপে ওঠে পুরো শহর। এ ধরনের বোমা সাধারণত ট্যাংক ধ্বংসের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সারা এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তারপরই দৌঁড়ে এল মাসজিদ ও আশপাশের মানুষেরা।

কিন্তু ইতোমধ্যে যা হওয়ার, তা হয়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থলে তাঁর গাড়ির বিক্ষিপ্ত টুকরো ছাড়া আর কিছুই মেলেনি। বিস্ফোরণের ফলে শাইখের দুই ছেলের দেহ ১০০ মিটার ওপরে উঠে গিয়েছিল। বিভিন্ন গাছের ডালে, বৈদ্যুতিক তারের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল তাদের দেহ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযামের (রহিমাহুল্লাহ) দেহকে রক্ষা করলেন। দেহটি একটি দেয়ালের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় পাওয়া গেল সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়। তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল তখন। তাঁকে তড়িঘড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু শহীদ হয়ে গেলেন তিনি। গত শতাব্দীর একজন উম্মাহদরদী ইসলামী ব্যক্তিত্বকে ইসলামের শত্রুরা এভাবেই শহীদ করে দিলো।

সে রাতেই শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযামকে জনসাধারণের কবরস্থানে দাফন করা হয়। শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তাঁর মৃত্যুর আগের দিন তাঁর ভাই তাঁকে বলেছিলেন, "আপনার নিরাপত্তা প্রয়োজন। যে কেউ আপনার ক্ষতি

...বে পরো সবধান থাকা উচিত আপনার।"

...শাইখ আযযাম হেসে ওঠেন। তিলাওয়াত করেন এই আয়াতটি,

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়াও, সে মৃত্যু তোমাদের সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে। তারপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর কাছে। অতঃপর তোমরা যা আমল করতে, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।"[৭]

পরদিনই তিনি শহীদ হয়ে যান। কিন্তু তাঁর পরিবার এবং স্ত্রী-পুত্র হতবিহ্বল হলেন না এতে তারা যেন জানতেনই তাদের পিতা, তাদের স্বামী একদিন শহীদ হবেনই। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীর কাছে এ ব্যাপারে তার অনুভূতি জানতে চাইলে তিনি বলেন,

"আমি সবসময়ই জানতাম এমন কিছু হবেই। তাঁকে ভালোবাসে এমন মানুষ যেমন অগণিত, তেমনিভাবে তাঁর শত্রুও অগণিত। তিনি জুমুআর জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পাঁচ মিনিট পরেই বোমার আওয়াজ শুনতে পাই আমি। বোমাটি ছিল এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের। আমি তখন রান্নাঘরে। ঘটনা জানতে পেরে আমি বললাম, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তারপর বললাম, আলহামদুলিল্লাহ। আমি আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যলিপির ওপর সন্তুষ্ট। ভয়টা হচ্ছিল সন্তানদের নিয়ে। কারণ আমি চাচ্ছিলাম না তারা জিহাদের ময়দানে প্রথম সারি ছাড়া অন্য কোথাও শহীদ হোক।"

রেখে যাওয়া পদাঙ্ক

শহীদের আরেক সন্তান হুজাইফা আযযামের বয়স তখন ১৫ বছর। তিনি বলেন,

"ইবরাহীমের সাথে সেদিন সকালে খেলতে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আব্বা বললেন, 'সূরা কাহফ এবং জুমুআর দিনের অন্যান্য আমল না করে যেতে

[৭] সূরা জুমুআ (৮)

পারবে না।' আমরা সেগুলো করে তারপর খেলতে যাই।"

তিনি আরও বলেন,

"আব্বাকে কখনো ঘরে বেশি দেখতাম না। সবসময়ই কাজ করতেন তিনি। ঘরে থাকাকালীনও দেখতাম তাঁর মুখ সবসময় আল্লাহর যিকরে ব্যস্ত। সবসময়ই আমাদের অন্তরে জিহাদের প্রতি ভালোবাসা ও শাহাদাতের প্রতি কামনা জাগরুক রাখতে চেষ্টা করতেন তিনি। এছাড়া কুরআনুল কারীম মুখস্থ করার প্রতিও উৎসাহিত করতেন।"

হুজাইফা আযযাম জর্ডানের আম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ বিভাগের ছাত্র।

শাইখ আযযামের সর্বকনিষ্ঠ ছেলে মুসআবের বয়স ছিল ৫ বছর। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "তোমার বাবা এখন কোথায়?" সে বলেছিল, "জান্নাতে।"

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, "তোমার বাবাকে কারা হত্যা করেছে?"

"কাফিররা।"

"কীভাবে?"

"গাড়ির নিচে বোমা রেখে। আব্বার সাথে আমার দুইভাই ইবরাহীম ও মুহাম্মাদও জান্নাতে আছে।"

"তুমিও কি জান্নাতে যেতে চাও ভাইদের মতো?"

"হ্যাঁ, আমিও তাদের মতো আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতে চাই। এরপর সায়্যিদুনা জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।"

"শহীদ হওয়ার আগে কী করতে চাও?"

"আব্বার মতো হতে চাই। তিনি যেভাবে শহীদ হয়েছেন আমিও সেভাবেই শহীদ হতে চাই।"

"তোমার বাবার শাহাদাতের খবর শুনে তোমার মা কী করেছে?"

"বলেছেন, মাবরুক (বরকতময় হয়েছে)।"

"তুমি কি কখনো আফগানিস্তান গিয়েছ?"

"হ্যাঁ, তিনবার।"

"তোমার আদর্শ কে?"

"আমার বাবা।"

"তুমি কি তাঁর জন্য কোনো দুআ করবে?'

"হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে জান্নাত দান করুন।"

এই হলো পাঁচ বছরের এক বাচ্চার আকীদাহ। বীরের সন্তান বীর।

শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযামের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তার ভাইদের বক্তব্য হলো,

> "রাশিয়া, আমেরিকা ও তাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো মুসলিমদের ভূমি সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর সমাধান করতে চাইছিল নিজেদের মনমতো। কিন্তু তাদের এই সমাধান মিথ্যা সমাধান। যে সমাধান তারা ফিলিস্তিনে করেছে, সে সমাধানই তারা করতে চাচ্ছিল অন্যান্য জায়গাতেও। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো, সমাধান একটাই। সেটা হলো বন্দুকের ধ্বনি। আর এই সমাধানই ছিল শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের মৃত্যুর কারণ।"

তারা আরও বলেন,

> "আমরা ফিলিস্তিনের মাটিতে আল্লাহর ফরজ বিধান জিহাদ করতে চেয়েছি। কিন্তু সেখানে সে সুযোগ পাইনি। আফগানে পেয়েছি সে সুযোগ। সুতরাং কাবুল থেকে কুদস পর্যন্ত বিজয়ী হওয়ার আগ পর্যন্ত কখনোই এ পথ পরিত্যাগ করব না আমরা।"

আল্লাহ তাআলা শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযামকে রহম করুন। তাঁকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন এবং আমাদেরকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আমীন।

উৎসাহদাতা ঘোড়সওয়ার

তামিম আল আদনানী রহ.

আগের অধ্যায়গুলোতে আলোচিত মনীষীদের সকলেই ছিলেন বহুবিদ্যায় পারদর্শী। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে বেশি ফুটে উঠেছিল তাদের ইলমের দিকটি। এই অধ্যায়ের আলোচ্য মনীষী তার ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর কিছু বাস্তব কর্মকাণ্ডের কারণে প্রসিদ্ধ। তাঁর নাম শাইখ তামিম আল আদনানী (রহিমাহুল্লাহ)।

শাইখ তামিম আল আদনানী ১৯৪২ সালে ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ খুরশিদ পাশা জেরুজালেমের গভর্নর ছিলেন সে সময়। আর পিতা মুহাম্মদ আল আদনানী ছিলেন ফিলিস্তিনের একজন প্রসিদ্ধ কবি। খুবই অভিজাত এবং স্বনামধন্য পরিবার।

ইসলাম যার কৈশোরের প্রেম

শাইখ তামিম আলেপ্পোতে বড় হন। মাধ্যমিকে পড়ার সময়ই দাড়ি বড় করতে শুরু করেন তিনি। এ নিয়ে তার বাবা তার সাথে খুব রাগারাগি করেন। বললেন, "আরে তুমি তো এখনও ছোট। বিয়েশাদী করোনি। এখনই দাড়ি রাখলে বুড়ো দেখাবে তোমাকে।" কিন্তু তামিম আল আদনানী কোনো তোয়াক্কা না করে কিশোর বয়স থেকে দাড়ি রাখা শুরু করেন।

কিশোর বয়সে হাররানে সফর করেন শাইখ তামিম। হাররান দামেশকের একটি অঞ্চল। সেখানে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন শেখ আহমদ হাররানের সাথে। শেখ আহমদ হাররান তাকে দেখামাত্র বললেন, "বাবা, তুমি কি তোমার পিতাকে রাগিয়ে দিয়েছ

দাড়ি রেখে?"

শাইখ তামিম হতবাক হয়ে গেলেন এ কথা শুনে। ভাবলেন যে, আলেপ্পো থেকে সংবাদ হাররানে কীভাবে এলো! শেখ আহমদ হাররান তাকে বললেন, "তুমি অল্পবয়সী। তোমার বয়সে দাড়ি রাখতে গেলে যে কারোরই এভাবে রাগারাগি করতে হয়।"

রাজনৈতিক জীবনের সূচনা

স্কুল ও কলেজের পাঠ চুকানোর পর শাইখ তামিম আল আদনানী কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি নিয়ে পড়াশোনা করতে গেলেন। একবার সমাজতান্ত্রিক ছাত্রদের আয়োজনে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাবা যেহেতু প্রসিদ্ধ আরব জাতীয়তাবাদী কবি ছিলেন, তাই তারা কনফারেন্সে তামিমকেও নিমন্ত্রণ করে। অনুরোধ করে সেখানে বক্তৃতা দিতে।

ধর্মীয় ভাবাপন্ন মানুষ হিসেবে তামিম আল আদনানীর মোটেও ইচ্ছে ছিল না সেখানে যাওয়ার। তাদের সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও ছেলে-মেয়ে অবাধ মেলামেশা দেখে উক্ত কনফারেন্স এড়িয়ে যেতে চাইলেন তিনি। কিন্তু তাদের চাপাচাপিতে বাধ্য হয়ে সেখানে উপস্থিত হন। বক্তৃতার ব্যাপারে পরামর্শ করে আসেন শাইখ আবদুল্লাহ আযযামের (রহিমাহুল্লাহ) সাথে। তারপর এমন এক বক্তৃতা দেন যে, প্রমাণ করে ছাড়েন সোশ্যালিজম ও ন্যাশনালিজম বলতে কিছু নেই।

পরবর্তী জীবনে এই কনফারেন্সের প্রসঙ্গ উঠলেই তাঁর প্রসিদ্ধ অট্টহাসি দিয়ে ওঠতেন তিনি। তাঁর ইন্টারভিউ ও ভিডিও বক্তব্যে প্রায়ই দেখা যায় যে, তিনি হো হো করে হাসতেন। শাইখ তামিম আল আদনানী বলেন, "সেদিন ওই বক্তব্য দিয়ে একেবারে গোলকধাঁধায় ফেলে দিয়েছিলাম তাদের। তারা আমাকে বলতে গেলে এক প্রকার বেরই করে দিয়েছিল।"

রাষ্ট্রীয় নজরদারিতে

শাইখ তামিম আল আদনানী (রহিমাহুল্লাহ) যখন এই বক্তব্য দেন, তখন সারা আরব জুড়ে ক্র্যাকডাউন চলছে। সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল আরবদের অধঃপতন। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে একজনও হিজাব পরা মেয়ে দেখা যেত না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই শাইখ তামিমের পেছনে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী লেগে গিয়েছিল। এমনকি বাসেও তাঁকে অনুসরণ করত তারা।

একবার শাইখ তামিম বাসে ওঠার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। যথারীতি অদূরে দাঁড়ানো রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা। কিন্তু বাস আসার পরও শাইখ তামিম অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। সবাই ওঠে যাবার পর যখন বাস পূর্ণ হয়ে গেল, তখন বাসে উঠলেন তিনি। গোয়েন্দাটি পেছন পেছন ওঠতে চাইলে শাইখ তামিম তাকে ধাক্কা দিয়ে বললেন, "আর জায়গা নেই।"

কিছুদিনের মধ্যে সবাই জেনে যায় যে, তাঁর পেছনে গোয়েন্দা আছে। একবার বাসে তিনি দুইজনের ভাড়া দিয়ে বললেন, "একটা আমার, আরেকটা ওই গোয়েন্দা ব্যাটার।" সাথে সাথে গোয়েন্দা বলে ওঠল, "আমাকে এভাবে অপমান করার কী দরকার ছিল?" শাইখ তামিম বললেন, "তুমি আমার জন্যে অনেক কষ্ট করছো তো, তাই।"

কর্মজীবন

শাইখ তামিম আল আদনানী (রহিমাহুল্লাহ) মাস্টার্স ডিগ্রি শেষ করার পর তার ভগ্নিপতি তাকে ব্যাংকে চাকরি করার জন্য বললেন। ভগ্নিপতি নিজেও ছিলেন ব্যাংকার। কিন্তু সুদজড়িত এই উপার্জনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন শাইখ তামিম। এমনকি তিনি ওই ভগ্নিপতির ঘরে চা পর্যন্ত খেতেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল যেহেতু ভগ্নিপতির আয় হারাম, তাই তার খাদ্য হারাম।

পরে তিনি একটি বালক-বালিকা বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানেই দেখা পান এমন এক সহকর্মীর, যিনি আর সবার চেয়ে আলাদা। পুরোপুরি পর্দানশীন ও ইসলামী অনুশাসনের অনুসারিণী। মুগ্ধ হয়ে তামিম তাঁর পরিবারের

বাবাকে এই নারীকে বিয়ে করার কথা জানান। প্রস্তাব শুনে তাঁর পিতা খুবই রাগারাগি করেন। আরব জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণায় নিমজ্জিত এই কবি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, তার ছেলে একজন 'পশ্চাৎপদ হিজাবি' নারীর স্বামী হবে।

এরপর শাইখ তামিম সৌদি আরবের একটি ব্রিটিশ এরোপ্লেন কোম্পানিতে চাকরি নেন। একদিন তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততা যাচাই করে দেখতে চাইলেন তাঁর বস। তিনি তাকে একটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কিনে আনতে বলেন। তামিম দোকানে গেলে দোকানদার বলল, "রিসিটে কত টাকা লিখব?"

তামিম আল আদনানী অবাক হয়ে বললেন, "কত টাকা লিখবেন মানে! যা দাম, তা-ই তো লিখবেন।"

"সেটা না। বলছিলাম আমি যদি রিসিটে কিছু টাকা বাড়িয়ে লিখে দিই, সেটা আপনি কোম্পানি থেকে নিতে পারবেন।"

"না! দাম যা হয়েছে, তা-ই লিখুন।"

ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে বসের কাছে ফেরত গেলে বস তার কাছে জানতে চাইলেন দাম কত ছিল। শাইখ তামিম আসল দামের কথাই বললেন। এরপর বস দোকানে গিয়ে যাচাই করে দেখলেন যে, কথা সত্যি। এমনকি দোকানদারের অসৎ প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার কথাও জেনে নেন। বস বুঝে গেলেন যে, তামিম আল আদনানী বিশ্বস্ত লোক। খুশি হয়ে বস তাকে একুশ হাজার রিয়াল বেতনের প্রস্তাব দেন। আজ থেকে ষাট বছর আগের কথা। তখনকার সময়ে একুশ হাজার রিয়াল বর্তমানে অন্তত পঞ্চাশ লাখ টাকা। পাশাপাশি মেডিকেল, এডুকেশন, ট্রাভেল অ্যালাউন্স তো ছিলই।

ধর্মীয় নেতৃত্বের হাতেখড়ি

সেই অফিসে ছিল একটি ছোট মাসজিদ। বস বুঝতে পেরেছিলেন যে, শাইখ তামিম ধার্মিক মানুষ। তাই তিনি তাঁকে খতিব হিসেবে নিয়োগ দেন। শাইখ তামিম কিন্তু এই অঙ্গনের লোক ছিলেন না। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষিত আলিম নন তিনি। এতদসত্ত্বেও তিনি অন্তর থেকে কথা বলতেন, যা মানুষের অন্তরে রেখাপাত করত। তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে আশপাশ থেকে বহু লোক আসতে শুরু করে এই মাসজিদে। ফলে চারবার উক্ত মাসজিদকে সম্প্রসারিত করতে হয়। শাইখ তামিম আল আদনানীর

(রহিমাহুল্লাহ) একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি নির্দ্বিধায় সত্য কথা বলতেন। এমনকি তা সমাজের বিরুদ্ধে গেলেও।

শাইখ তামিম আল আদনানী (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত মাসজিদে প্রথম প্রথম সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত নিয়ে কথা বলতেন। তারপর বলতে শুরু করেন ব্যাংক, সুদ, ঘুষ নিয়ে। লোকজন আপত্তি শুরু করলো। বলল, "এসব বিষয়ে কথা বলবেন না। স্পর্শকাতর বিষয়।"

তিনি তাদেরকে বললেন, "তাহলে কী নিয়ে কথা বলব?"

"এই সালাত-সাওম, নবিজির গুণাবলী এইসবে সীমাবদ্ধ থাকুন।"

"কেন?"

"দেখুন, আপনি যে মাসজিদে কথা বলেন, তা মিলিটারি এয়ার বেসে। আমরা আপনাকে একুশ হাজার রিয়াল বেতন দিই। সাথে আরও পয়ত্রিশশত রিয়াল এই মাসজিদের ইমাম হিসেবে। আমরা চাইলেই আপনার এই চাকরি ছিনিয়ে নিতে পারি। তাই যা বলবেন, সাবধানে বলবেন।"

শাইখ তামিম আল আদনানী উত্তর দিলেন,

"প্রত্যেকটা পয়সা আমাকে আল্লাহ তাআলাই দেন। আমার যা কিছু আছে, সব আল্লাহ তাআলার দান। মাসজিদের ইমাম হিসেবে পাওয়া পয়ত্রিশশ রিয়ালও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বোনাস। যদি এটি চলেও যায়, তাও আল্লাহ তাআলার কাছে যাবে। আমি আমার মাসজিদের সমস্ত বেতন জমা করে আফগানের মুজাহিদদের দান করব।"

জিহাদের জযবা

১৯৮৪ সালে মক্কায় থাকা অবস্থায় শাইখ তামিম আল আদনানী (রহিমাহুল্লাহ) আফগান জিহাদের কথা শুনতে পান। শোনেন আফগান নারী-পুরুষ ও শিশুদের ওপর সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অত্যাচারের কথা। কীভাবে তারা নারীদের তুলে নিয়ে যেত এবং হেলিকপ্টারে ধর্ষণ করে হেলিকপ্টার থেকে নিচে ফেলে দিত। এসব শুনে [illegible] করে কাঁদতেন তিনি। যেন এ সকল নারী ও শিশু তাঁর নিজের সন্তান।

জিহাদের জযবা পেয়ে বসে তাঁর অন্তরে। আফগান মুজাহিদিনের যুলুম-নির্যাতন সয়ে কষ্ট স্বীকার করে জিহাদ করার ব্যাপারটা প্রবলভাবে নাড়া দেয় তাকে। তিনি পঞ্চাশ হাজার ডলার সংগ্রহ করে এক গ্রীষ্মে আফগান মুজাহিদিনদের কাছে প্রেরণ করেন।

এরপর ১৯৮৬ সালে সৌদি আরবে একটি বক্তৃতা দেন শাইখ তামিম। শিরোনাম- 'আফগানিস্তানে আমার প্রথম সফর'। বক্তৃতাটি অডিও আকারে সকলের কাছে ছড়িয়ে পড়ে। দেদারসে বিক্রি হতে থাকে। বিক্রিলব্ধ মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার প্রেরণ করেন ওই আফগান মুজাহিদিনের কাছেই।

১৯৮৭ সালের রমাদান মাসে শাইখ তামিম আরও একটি বক্তৃতা দেন। এবার শিরোনাম- 'আফগানিস্তানে আমার দ্বিতীয় সফর'। এই বক্তৃতাটিও যথেষ্ট প্রসিদ্ধ হয় এবং রেকর্ড বিক্রি হতে থাকে। এই রেকর্ড বিক্রি থেকেও প্রায় মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করে আফগান পাঠানোর জন্য তৈরি করেন তিনি।

এই অবস্থা দেখে কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসল। ভাবল, "এ তো দেখি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।" তারা শাইখ তামিমের কাছে এসে বলল, "টাকাগুলো আমাদের কাছে দিন। আমরা আফগান পৌঁছে দেবো।" শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, "অসম্ভব! এই টাকা আমি সরাসরি আমার হাত দিয়ে আফগান পৌঁছাব। মুজাহিদদেরকেও আমি এ কথাই দিয়ে এসেছি।"

তারা বলল, "আমাদেরকে উচ্চপর্যায় থেকে আদেশ দেওয়া হয়েছে আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে। আপনি এই আদেশ প্রত্যাখ্যান করছেন!"

শাইখ তামিমের বললেন, "আমার কাছে আদেশ তো সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে।"

একপর্যায়ে জোরজবরদস্তি শুরু করে সরকারি লোকেরা। শাইখ তামিমও কম যান না। তিনি ছিলেন বিশাল আকৃতির। ওই লোকদের ধরে ধরে মাটিতে ফেলে দেন তিনি। উচ্চস্বরে বলতে থাকেন, "এগুলো মুজাহিদদের টাকা, এগুলো মুজাহিদদের টাকা। আমার স্ত্রী পুত্র-কন্যাও টাকা দিয়েছে। এ টাকা আমি কিছুতেই তোমাদের হাতে দেবো না।"

সশরীরে জিহাদ

পরদিন সকালে সরকারি বাহিনীর এক ভালো লোক এসে শাইখ তামিম আল আদনানীকে (রহিমাহুল্লাহ) বলল, "এই টাকা যদি নিজের হাতে আফগান মুজাহিদিনের কাছে পাঠাতে চান, তবে আপনি চুপচাপ চলে যান। কাউকে বলে যাবেন না।" তিনি বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে।"

কিন্তু পরের শুক্রবার খুতবায় দাঁড়িয়ে শাইখ তামিম খোলাখুলি বললেন, "আগামী বুধবার পাকিস্তান এয়ারওয়েজের এই সময়ের এত নম্বর ফ্লাইটে করে তামিম আল আদনানী আফগান মুজাহিদিনদের জন্য টাকা নিয়ে যাবে। কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে বিধবা বানাতে চায়, সন্তানদের ইয়াতীম বানাতে চায়, মাকে সন্তানহারা বানাতে চায়, সে যেন তামিম আল আদনানীকে এয়ারপোর্টে বাধা দেয়।" মূলত কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য করে এ কথা বলেন তিনি।

শাইখে'র এই সাহসী কাজটি ছিল হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অনুসরণ। অন্যান্য সাহাবি হিজরত করছিলেন চুপিসারে। কিন্তু হযরত জনসম্মুখে ঘোষণা দেন, "আমি আগামীকাল হিজরত করে মদীনায় যাচ্ছি। কারো যদি নিজেদের স্ত্রীদের বিধবা, সন্তানদের ইয়াতিম এবং মায়েদের সন্তানহারা করতে ইচ্ছে করে, সে যেন আমাকে বাধা দেয়।"

এরপর শাইখ তামিম আফগানিস্তান গিয়ে জিহাদে শরীক হন। তাঁকে যারা যুদ্ধ করতে দেখেছেন তারা বলেছেন, "বোম্বিং-এর সময় আমরা নিচু হয়ে শুয়ে পড়তাম। কিন্তু শাইখ তামিম আল আদনানীকে এ কথা বলতে পারতাম না। কারণ, তাঁর ওজন ছিল অনেক বেশি। তিনি প্রায় ১৫০ কেজি ওজনের লোক ছিলেন। তার ওপর ছিলেন অসুস্থ। এতদসত্ত্বেও তিনি আফগান জিহাদে শরিক হয়ে পাহাড় থেকে পাহাড়ে চড়েছেন।"

অতিরিক্ত ওজনের কারণে বিভিন্ন অভিযানে তাকে প্রায়ই নেয়া হতো না। তারপরও যাওয়ার জন্য গোঁ ধরতেন তিনি। ঘোড়ার পিঠে বসলে ওজনের চাপে মাটিতে বসে যেত ঘোড়ার পা। আফগানিস্তানের উঁচু উঁচু পাহাড়ে ঘোড়ায় চড়া এমনিতেই খুব বিপদজনক। কেউ যদি একবার পা পিছলে পড়ে যায়, তবে তার দফারফা হয়ে যাবে।

আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল

সারা রাত জেগেও জিহাদের ভূমি পাহারা দিতেন শাইখ তামিম। কোনো চেকপোস্টে ধরা পড়ার মতো অবস্থায় পড়লে সূরা ইয়াসিন পড়তে শুরু করতেন। বিশেষ করে এই আয়াত,

وَ جَعَلۡنَا مِنۡ بَیۡنِ اَیۡدِیۡہِمۡ سَدًّا وَّ مِنۡ خَلۡفِہِمۡ سَدًّا فَاَغۡشَیۡنٰہُمۡ فَہُمۡ لَا یُبۡصِرُوۡنَ

"আর আমি তাদের সামনে প্রাচীর ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি। তারপর তাদেরকে আবৃত করেছি; ফলে তারা দেখতে পায় না।"[৮০]

এই আয়াতের বদৌলতে প্রত্যেকটি চেকপোস্টে পার পেয়ে যেতেন তিনি। অন্যান্য মুজাহিদ কোথাও যেতে নিলে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো, চেক করা হতো, আরও নানান ধরনের টালবাহানা। কেউ পার পেতেন, আবার কেউ কেউ ধরা পড়তেন। কিন্তু শাইখ তামিমকে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি বিপদে উদ্ধার হওয়ার রাস্তা দেখিয়েছেন।

আসলে এই আয়াতের ওপর তার বিশ্বাস ছিল। ঈমান ছিল। ঈমানবিহীন তিলাওয়াত এবং দুআয় কোনো ফায়দা হয় না। সাহাবায়ে কেরামের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যুগেও এমন এক উদাহরণ আছে। একবার এক লোকের খুব অসুখ হলো। সকলে সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিতে লাগল তাকে। কিন্তু তার নিরাময় হচ্ছিল না। কিন্তু উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিতেই সুস্থ হয়ে গেল সে।

শাইখ তামিম আল আদনানী (রহিমাহুল্লাহ) মুজাহিদিনদের জন্য ডলারের পাশাপাশি স্বর্ণও সংগ্রহ করতেন। সেগুলো একটি ব্যাগে ভরে আফগান যেতে যেতে সূরা ইয়াসিনের ঐ আয়াত তিলাওয়াত করতে থাকতেন তিনি। চেকপোস্টে এলে তাঁর সমস্ত ব্যাগ চেক করা হতো, কিন্তু কোনো না কোনোভাবে স্বর্ণ রাখা ব্যাগটি চেক করা হতো না। এটি আল্লাহর ওপর তাঁর তাওয়াক্কুলের প্রমাণ।

[৮০] ...সিন, ৩৬:...

অভিমানী মুজাহিদ

মুজাহিদদের আমীর আবূ আবদুল্লাহ কোনোভাবেই তামিম আল আদনানীকে সম্মুখ জিহাদে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ তো আগেই বলা হলো, অতিরিক্ত ওজন। একবার কোনো কারনে আবূ আবদুল্লাহ অন্য কোথাও গেলেন। ভারপ্রাপ্ত আমীর হলেন আবূ হাজির আল ইরাকী। আবূ হাজির আল ইরাকি পরবর্তীতে নিউইয়র্কে ধরা পড়েন এবং কারাগারে আছেন।

শাইখ তামিম ভাবলেন, এই-ই সুযোগ। তিনি আবূ হাজির আল ইরাকির কাছে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি নিতে গেলেন। বললেন, "দেখুন, শত্রুরা এসে গেছে। আমাদেরকে এখনই যেতে হবে।" কিন্তু আবূ হাজির কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না কী করা উচিত। কারণ, একদিকে আবূ আবদুল্লাহর আদেশ, অপরদিকে শাইখ তামিম আল আদনানী একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি বললেন, "আবূ আবদুল্লাহ আসলে আপনি তাকে বলে যাবেন। আমি অনুমতি দিতে পারছি না।" কিন্তু শাইখ তামিম বাচ্চাদের মতো শুরু করলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে অনুমতি দিয়ে দিলেন আবূ হাজির।

শাইখ তামিম আল আদনানী পাহাড়ের ওপর চলে গেলেন। এর মধ্যে আবূ আবদুল্লাহ ফিরে এসে খোঁজ খবর নিতে লাগলেন কে কোথায়। শাইখ তামিম পাহাড়ের ওপরে গেছেন শুনে তিনি অবাক হয়ে বললেন, "এক্ষুনি তাকে ডেকে নিয়ে আসো। গিয়ে বলো যে, আমীর ডেকেছেন।" প্রথমে তিনি আসতে চাননি। তখন তাঁকে বলা হলো, "আমীরের আনুগত্য করা আল্লাহর আনুগত্য করার মতোই। যদি এখানে কেউ কোনো বিপদে পড়ে যায় এবং আপনি যদি ফিরে না আসেন, তবে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সামনে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।"

বাচ্চাদের মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেন তামিম আল আদনানী। আবূ আব্দুল্লাহকে বললেন, "আল্লাহর কসম! আপনি আমাকে জিহাদে যাবার অনুমতি না দিলে খাবার-পানি কিছুই মুখে দেবো না।" আবূ আবদুল্লাহ ভাবলেন, হয়তো মজা করছেন। কিন্তু প্রথম দিন গেল, দ্বিতীয় দিন গেল, তৃতীয় দিনও গেল। একদিনও শাইখ তামিম আল আদনানী কিছুই খেলেন না। দুর্বল হয়ে গেলেন তিনি। তা দেখে বাধ্য হয়ে আবূ আবদুল্লাহ তাকে পাহাড়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। শাইখ আদনানী

(রহিমাহুল্লাহ) পাহাড়ে ওঠে মর্টার ছুঁড়লেন, গুলি ছুঁড়লেন। তারপর তাঁকে আবারও বেসে ফিরে আসার জন্য আদেশ দেয়া হয়।

১৯৮৭ সালের রমাদান মাসে বিখ্যাত 'লায়ন ডেন অপারেশন' সংঘটিত হয়। মুজাহিদীনদের বেসক্যাম্পগুলো ছিল পূর্ব আফগানের জাজিতে। সোভিয়েত সেনাবাহিনী বোমা হামলা করে গুড়িয়ে দেয় সেগুলো। ২০০০ সেনাবাহিনীর বিপরীতে মাত্র ৫০ জন মুজাহিদীন ছিলেন। অর্থাৎ, প্রত্যেক মুজাহিদের বিপরীতে প্রায় চল্লিশজন করে সোভিয়েত সেনা। এই ৫০ জন ছিলেন স্রেফ বেসক্যাম্প পাহারার জন্য। এর মধ্যে শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম, শাইখ তামিম আল আদনানী, নাশিদ গায়ক জুবায়ের আল মাদানী, শাইখ উসামা বিন লাদেনও ছিলেন (রহিমাহুমুল্লাহ)।

শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম তখন তামিম আল আদনানীকে যোগাযোগের দায়িত্ব দেন। সোভিয়েত বাহিনীর অবিরত গুলি বোমাবর্ষণের সময় কুরআন তিলাওয়াত করতে শুরু করেন শাইখ তামিম। জাহান্নামের আজাব সম্পর্কিত আয়াতগুলো পড়ছিলেন তাড়াতাড়ি আর জান্নাতের নিয়ামাত সম্পর্কিত আয়াতগুলো ধীরে ধীরে। আশা করছিলেন যে, এই আয়াতগুলো পড়াকালীন শাহাদাত বরণ করবেন। মুহুর্মুহু গুলি ও বোমা বর্ষণের ফলে বাংকারের ছাদ কাঁপছিল। কিন্তু শাইখ তামিম নির্বিকার ভঙ্গিতে এক পারা দুই পারা করে ছয় পারা তিলাওয়াত করে ফেলেন। বাঙ্কার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বলা হয় তাঁকে। বলা হলো, "এ কী করছেন আপনি? যে অসম যুদ্ধে মৃত্যু নিশ্চিত, সেখানে মৃত্যুর আশায় বসে থাকা হারাম।"

তা শুনে শাইখ তামিম আল আদনানী (রহিমাহুল্লাহ) বেস ক্যাম্পে ফিরে যান। আমীর আবূ আবদুল্লাহ সবাইকে ফিরে যেতে বললেন। এ আদেশ শুনে কান্না শুরু করেন তামিম আল আদনানী। কান্নার গমকে তার শরীর কাঁপছিল, ভিজে যাচ্ছিল দাড়ি। তিনি বললেন, "আমাদের এত কষ্ট এত পরিশ্রম এবং এতদুর পর্যন্ত আসা কি যুদ্ধের জন্য নয়? আমরা তো এখানে যুদ্ধ করার জন্য এসেছি। তবে কেন ছেড়ে যাব?" অবশেষে আমীর আবদুল্লাহ তাকে বোঝালেন, "দেখুন, এ যুদ্ধ অসম যুদ্ধ। জয়ের সম্ভাবনা এখানে নেই। যদি অপরাপর মুজাহিদদের কিছু হয়ে যায়, তাহলে সেটার জন্য আপনি দায়ী থাকবেন।"

তা শুনে শাইখ তামিম আল আদনানী (রহিমাহুল্লাহ) ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন।

জনপ্রিয়তা

শাইখ তামিম আল আদনানী (রহিমাহুল্লাহ) আবার সৌদি আরবে গেলেন। কিন্তু এবারে তিনি গিয়ে 'আফগানিস্তানে আমার তৃতীয় সফর' শীর্ষক যে বক্তব্য দিতে চেয়েছিলেন, তা দিতে দেওয়া হলো না। নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো তাঁর বক্তব্য। কিন্তু শাইখ তামিম কোনো-না-কোনোভাবে ছড়িয়ে দিলেন তার বক্তব্যের রেকর্ড। এটিও প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হলো। হাল ছেড়ে দিল কর্তৃপক্ষ।

এরপর শাইখ তামিম কাতার সফর করেন। নিজেদের জান মাল দিয়ে সব সময় জিহাদকে সহায়তা করে এসেছে কাতারের জনগণ। তারা শাইখকে নিরাশ করেননি।

এরপর আবার আফগানিস্তানে ফিরে এসে পুরোপুরি জিহাদে আত্মনিয়োগ করেন তিনি। নিজের পরিবারকেও নিয়ে আসেন এখানে। সঙ্গ দিতে থাকেন শাইখ আবদুল্লাহ আযযামকে (রহমতুল্লাহি আলাইহি)। তাঁরা উভয়ে মিলে জিহাদের কাজে নিজেদের উজাড় করে দেন।

শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম বিভিন্ন দেশে গিয়ে বক্তৃতা দিতেন। যেমন কাতার, পাকিস্তান। শাইখ তামিম আল আদনানী যেতেন আফ্রিকার দেশগুলোতে। তিনি আমেরিকাতেও সফর করেছেন। এছাড়াও করাচি, বাংলাদেশ, ভারত, আরব আমিরাত ও এশিয়ার অনেক দেশে গেছেন তিনি। তিনি যেখানেই যেতেন, মানুষ তাঁর চারপাশ ঘিরে ধরত। একটি বক্তৃতা দিলে আরও একটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হতো তাকে। এর মাধ্যমে তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে তা আফগানে নিয়ে যেতেন।

একবার আরব আমিরাতে তিনটি বক্তব্য দেওয়ার পর তাঁর কাছে সাড়ে চার কেজি স্বর্ণ এসেছিল। মহিলারাই দিয়েছিল সব। আফগান জিহাদের জোশ ও জজবা মহিলাদের অন্তরকেও প্রভাবিত করেছিল। শাইখ আদনানী অনেক দুআ করলেন তাদের জন্য। তাদেরকে এও বললেন, "আমি মুজাহিদদেরকে আপনাদের কথা বলব এবং আপনাদের জন্য দুআ করতে বলব।"

সাহসিকতা

একবার আরব আমিরাতের বিমানবন্দরে একটি ঘটনা ঘটল। শাইখ তামিম আল আদনানীর (রহিমাহুল্লাহ) কাছে ছিল ফিলিস্তিনি পাসপোর্ট। তাই তাঁকে আরব আমিরাতে ঢুকতে দিচ্ছিল না তারা। নানান জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। কিন্তু অমুসলিমদের ঢুকতে দিচ্ছিল ঠিকই। শাইখ আরব আমিরাতে ঢুকতেই প্রত্যাখ্যান করেন। পাসপোর্ট ফেরত নিয়ে সবার সামনে বললেন, "দেখো, তারা মুসলিমদের ঢুকতে দেয় না, কিন্তু কাফিরদের ঢুকতে দেয়।'

আরেকবার তিনি নাইজেরিয়া থেকে মিশর হয়ে ইয়েমেন যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গেল মিশরের পুলিশ। জিজ্ঞেস করল, তিনি কোথা থেকে আসছেন এবং কোথায় যাচ্ছেন। শাইখ তামিম সরাসরি বললেন, "আমি সোজাসাপ্টা মানুষ। সোজাসাপ্টা কথা বলতে ভালোবাসি। আপনারা জানতে চেয়েছেন, তাই বলে দিচ্ছি। আমি আফগান মুজাহিদ। আফগানেই যাচ্ছি।"

তারা বলল, "আফগানে কি কোনো মিশরীয় আছে?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ আছে। আবূ আবদুল্লাহ, আবূ মুহাম্মাদ, আবূ ইসমাঈল..."

"ফাজলামো করেন? এগুলো তো ছদ্মনাম!"

"দেখুন, মিশরীয় অনেক আছে। কিন্তু তাদের আসল নাম, উপাধি এসব জানি না।"

"আচ্ছা, মুহাম্মদ আল ইসলামবুলিকে চেনেন কি না?"

মুহাম্মদ আল ইসলামবুলি ছিলেন খালেদ আল ইসলামবুলির ভাই, যিনি আনোয়ার সাদাতকে হত্যায় অংশগ্রহণ করেন। মিশরের কুখ্যাত শাসক আনোয়ার সাদাত ইজরায়েলের সাথে শান্তিচুক্তি করেছিল। পুলিশের প্রশ্নের জবাবে শাইখ তামিম আল আদনানী বললেন, "এমন কি কেউ আছে, যে আমাদের বীর খালিদ আল ইসলামবুলিকে চেনে না!"

নির্ভীক তামিম আল আদনানী তাঁর জিজ্ঞাসাবাদকারীদের পালটা প্রশ্ন করতে শুরু করেন। বলেন, "আমি কায়রোতে বক্তৃতা দিতে চাই। আপনারা দিতে দেবেন?"

অবশেষে তারা তামিম আল আদনানীকে যেতে দেয়। কিন্তু বক্তৃতা দেওয়া নিষিদ্ধ করে

দেয় তার জন্য।

ইন্তিকাল

শাইখ তামিম আল আদনানী (রহিমাহুল্লাহ) যেহেতু অতিরিক্ত ওজনের কারণে যুদ্ধে শরিক হতে পারতেন না, তাই ওজন কমানোর তোড়জোড় শুরু করেন তিনি। এই ওজন নিয়ে তিনি নাইজেরিয়া, মিশর, কাতার সফর করেছেন। তাঁকে কিছু ভাই পরামর্শ দিল, "আপনি আমেরিকাতে চলে যান। সেখানে আপনি ভালো চিকিৎসা পাবেন।" শাইখ তামিম তা-ই করেন।

কিন্তু সেখানে গিয়েও অপারেশনের অপেক্ষায় বসে রইলেন না তিনি। বক্তৃতা করতে লাগলেন বিভিন্ন মাসজিদে মাসজিদে ঘুরে ঘুরে। বিভিন্ন কনফারেন্সে যোগ দিতে লাগলেন। তার প্রতিটি বক্তৃতার রেকর্ড দেদারসে বিক্রি হতে লাগল। সেসব অর্থ যেতে থাকল আফগানিস্তানে।

তিনি প্রতি সপ্তাহে একবার শাইখ আবদুল্লাহ আযযামকে ফোন করতেন। বলতেন, "অপেক্ষা করুন। আমি আসছি। আমার ওজন পাঁচ কেজি কমে গেছে।" প্রতি সপ্তাহে এভাবে ওজন জানাতেন তিনি। আসলেই তার ওজন ১৫০ কেজি থেকে কমে ১০৯ কেজিতে চলে এসেছিল। কিন্তু একদিন তিনি ফ্লোরিডাতে একটি কনফারেন্সে যোগ দেয়ার জন্য যাচ্ছিলেন। দিনটি ছিল ১৯৮৯ সালের ১৮ই অক্টোবর। হাসপাতালে যাওয়ার পথে তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়। ইন্তেকাল করেন তিনি। রহিমাহুল্লাহ রাহমাতান ওয়াসিআতান।

তাঁর দেহ ফ্লোরিডা থেকে ইসলামাবাদ হয়ে পেশোয়ারে আনা হয়। অন্যান্য মুজাহিদ নেতার সাথেই তাঁকে কবরস্থ করা হয় সেখানে। শাইখ তামিমের সারাজীবনের ধ্যান-জ্ঞান ছিল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যোগদান। আমেরিকা যাওয়ার উদ্দেশ্যও ছিল ওজন কমিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণের উপযুক্ত হওয়া।

পেশোয়ারে আনার আগে অনেকক্ষণ ফ্লোরিডার হাসপাতালে ছিল তাঁর মরদেহ। তাঁর স্ত্রী সেখানে গিয়ে স্বামীর উপনাম ধরে ডেকে বলেন, "জান্নাতে আমাদের দেখা হবে, আবু ইয়াসির!" আবু তারেক নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন সেখানে। তিনি বলেন,

"আমি দেখেছি শাইখ তামিম আল আদনানীর দেহ থেকে পানি ঝরে পড়ছিল।

রুমাল দিয়ে ওই পানি মুছে দিচ্ছেন তার স্ত্রী। এক ধরনের সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ছিল সেই কক্ষ থেকে। কেউ কেউ এসে বলছিল, 'আপনারা এই মরদেহে কোনো সুগন্ধি দিয়ে দিয়েছেন? সুগন্ধির নাম কী?'"

এর এক মাস পর শাইখ আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) নিহত হন। শহীদ হওয়ার পূর্বে তাঁর লেখা সর্বশেষ বই 'মাশাকুল হুর' তথা 'জান্নাতি হুরদের কারা ভালোবাসে'। এ বইয়ে ১০০ জন শহীদের জীবনী আলোচনা করেন তিনি, যারা আফগান ভূমিতে শহীদ হয়েছেন। সর্বশেষ ঘটনাটি শাইখ তামিম আল আদনানীর (রহিমাহুল্লাহ)। শাইখের নাম সেখানে লেখা 'শহীদ বীর শাইখ তামিম আল আদনানী রহিমাহুল্লাহ'।

অথচ তিনি তো যুদ্ধে মারা যাননি। না আফগান জিহাদে, না চেচনিয়ায়। না গুলির আঘাতে, না মিসাইলের আঘাতে। তিনি ইন্তেকাল করেছেন আমেরিকার হাসপাতালে। তবুও তাঁকে শহীদ আখ্যায়িত করার কারণ হলো তাঁর নিয়্যাত। আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি হিজরত করবে, আল্লাহর জন্য কোনোকিছু করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে শহীদ হবে।

শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, "মানুষ অনেক কারণেই ইন্তিকাল করে। কিন্তু তাঁর মৃত্যু কী হিসেবে ধর্তব্য হবে, তা নির্ভর করে তার নিয়্যাতের ওপর। কেউ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ না করেও নিয়্যাতের কারণে শহীদ হবে। আবার অনেকে জিহাদে গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করেও জাহান্নামে যাবে। একমাত্র তার নিয়্যাতের কারণে।"

তিনি আরও লিখেছেন, "কেউ যদি আল্লাহর জন্য কিছু করতে বের হয়, এরপর রোগ বা অন্য কোনো জটিলতার কারণে মৃত্যুবরণ করে, তবু সে তার নিয়্যাতের বদৌলতে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে।"

শাইখ তামিম আল আদনানীকে নিয়ে আবদুল্লাহ আযযাম কতই না সুন্দর বলেছেন,

> "আপনি ইন্তিকাল করেননি। কীভাবেই বা করবেন, যেখানে আপনার স্মৃতি আমাদের জীবনকে করেছে পরিপূর্ণ। আপনার অন্তরে যে দরদ ছিল, তা আপনি ছড়িয়ে দিয়েছেন অন্তর থেকে অন্তরে। আপনার যে গলার স্বর ক্যাসেটে ক্যাসেটে সারা দুনিয়ায় ভাসছে, তা আল্লাহর শত্রুদের হৃদয়ে কম্পন ধরানোর

জন্য যথেষ্ট। আপনি এমন কোনো বড় লেখক ছিলেন না। কিন্তু আপনার শব্দে এমন জাদু ছিল, যা হৃদয় আকর্ষণ করতে যথেষ্ট। আপনি বড় কোনো আলিম ছিলেন না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপনাকে ফিকহের বহুল জ্ঞান দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে আলোকিত করেছেন এবং আপনার আলোয় আপনার মাধ্যমে অন্যান্য লোকের উপকার করেছেন। আপনি হয়তো সেই ঘোড়সওয়ার নন, যিনি ঘোড়া নিয়ে মাঠে মাঠে দৌড়ে বেড়ান। আপনি হচ্ছেন সেই ঘোড়সওয়ার, যিনি ঘোড়ায় বসে অন্যদের উৎসাহিত করেন।"

আল্লাহ তাআলা শাইখ তামিম আল আদনানীর উপর রহম করুন। তাঁর সকল ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করুন। তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। তিনি সহ আরও যে সকল মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করুন। তাঁদের প্রতি রহম করুন। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিলানোর তাওফীক দান করুন। তাঁদের জীবনকে আমাদের জন্য শিক্ষা অর্জনের ওসীলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।